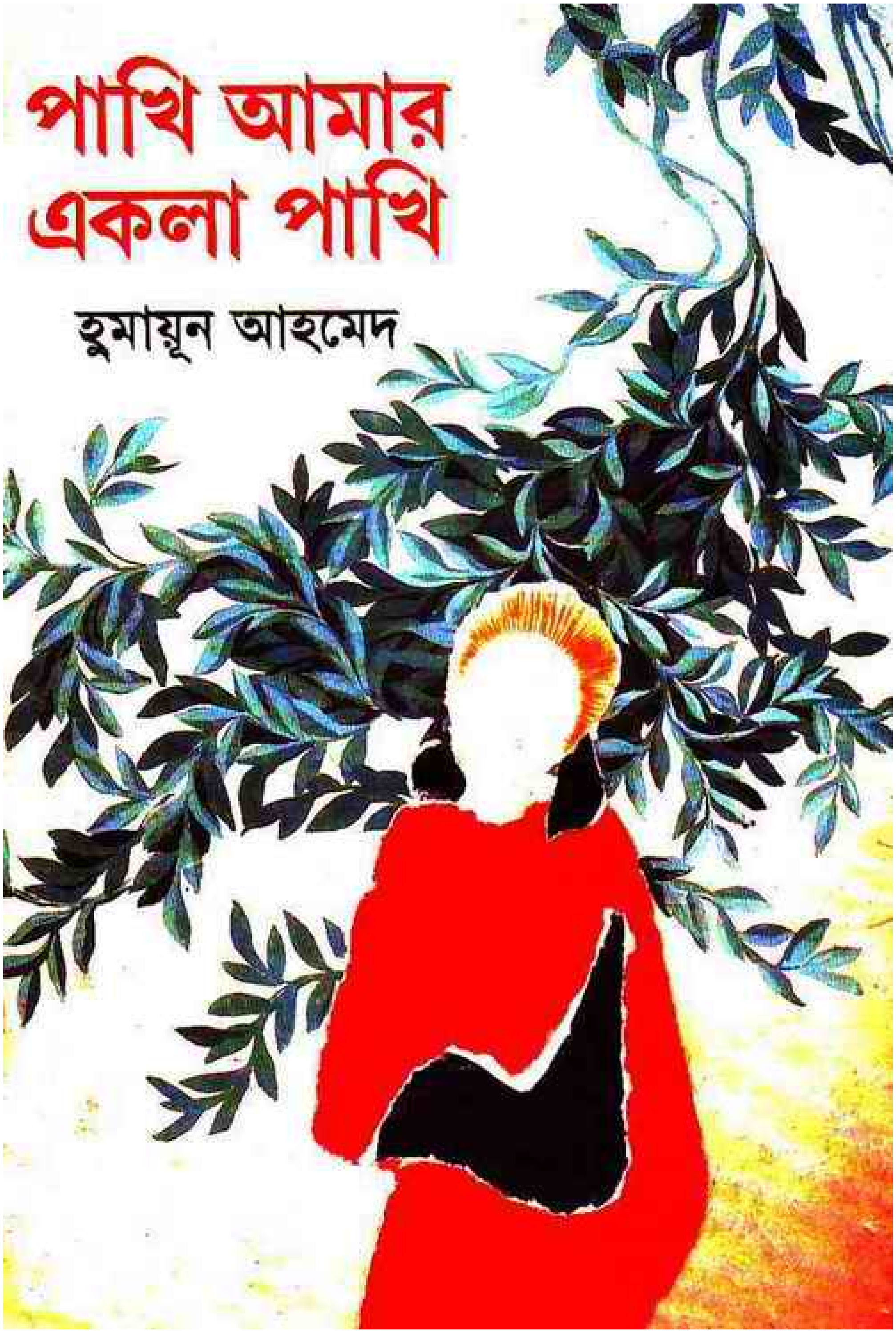
পাখি আমার
একলা পাখি
হুমায়ূন আহমেদ

১

আমি একটা খুন করব এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিয়ে ফেললাম। ক'দিন খুব অস্থির-অস্থির লাগছিল। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর অস্থির ভাব পুরোপুরি কেটে গেল। এক ধরনের আরামদায়ক আলস্যে মন ভরে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিল ঘড়ির দিকে তাকালাম। ভোর ন'টা পঁয়ত্রিশ। মিনিটের লাল কাঁটা সাতের ঘরে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত যে মুহূর্তে নেয়া হল, সেই মুহূর্তটা জানা থাকা দরকার। টেবিল ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা থাকে না। কাজেই মুহূর্তটা আরো সূক্ষ্মভাবে জানা গেল না। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে।

আমার চোখ টেবিল ঘড়ির লাল কাঁটায় আটকে গেছে। আমি তাকিয়েই আছি। একসময় রূপা আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, এই কি দেখছ? রূপা আমার স্ত্রী। সে ধবধবে একটা শাদা চাদর গায়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে আমার পাশে শুয়ে আছে। শাদা চাদর গায়ে জড়ানো বলেই বোধহয় তাকে দেখাচ্ছে একটা বেড়ালের মতো। এম্নিতে অবশ্যি তার চরিত্রে বেড়াল ভাব অত্যন্ত প্রবল। সে সারাক্ষণই আরাম খোঁজে। ন'টা সাড়ে ন'টার আগে কোনোদিনই বিছানা ছেড়ে নামে না। আজ ছুটির দিন। কাজেই দশটা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। রূপা আবার আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, কি দেখছ?

আমি হালকা গলায় বললাম, ঘড়ি দেখছি।

'ক'টা বাজে?'

'ন'টা পঁয়ত্রিশ।'

রূপা হাই তুলে বলল, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি রাতে ঘুমুতে যাবার সময়ও দেখেছি ন'টা পঁয়ত্রিশ। চাবি দেয়া হয়নি।

আমি আবার তাকালাম—রূপার কথাই ঠিক। মিনিটের লাল কাঁটা এখনো সাতের ঘরে স্থির হয়ে আছে। আমি কখন এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলাম তা জানা গেল না। মন আগে থেকেই খুঁতখুঁত করছিল। এখন বিরক্তিতে ভরে গেল। বিরক্ত হলেই আমার মুখে থুথু জমে। থুথু জমছে। মুখ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে থুথুতে।

রূপা বলল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর আমার হাতঘড়ি আছে। সময় দেখতে চাইলে ঐ ঘড়িতে দেখ। তবে ছুটির দিনে এত কিসের ঘড়ি দেখাদেখি? ঘুমাও তো।

এই বলেই সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়ল। রূপা অতিদ্রুত ঘুমুতে পারে। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। তার সংঙ্গে পরিচিত নয় এমন কেউ হলে ভাবে হয়তো কথার খেই হারিয়ে থেমে গেছে। যারা তার সংঙ্গে পরিচিত তারা সবাই জানে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেনে কোথাও যাবার সময় তাকে জানালার কাছের একটা সীট দিতে হয়। সে খোলা জানালায় মাথা রেখে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি বিছানা থেকে নামলাম। জমে থাকা থুথু জানালা দিয়ে ফেললাম। আমার ঘরটা ঠিক রাস্তার উপর। থুথু কারো মাথায় পড়ল কিনা কে জানে! পড়লে পড়ুক। ড্রেসিং টেবিলে রাখা রূপার হাতঘড়ি দেখলাম, সকাল সাতটা দশ। ছুটির দিনে এত ভোরে বিছানা ছাড়ার কোনো মানে হয়? রূপাকে জড়িয়ে ধরে আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকব? তেমন কোনো প্রবল ইচ্ছাও বোধ করছি না। তাছাড়া রূপার গা ঠাণ্ডা। ধাতুর নামে নাম রাখার কারণেই বোধহয় তার বডি-টেম্পারেচার স্বাভাবিকের চেয়ে এক দু' ডিগ্রী কম! রূপা চোখ বন্ধ করে ঘুম-ঘুম গলায় ডাকল, 'এ্যাই এ্যাই।'

'বল।'

'তুমি কি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছ?'

'না।'

'একটু যাও না, প্লীজ। মুনিয়াকে বল আমাকে এককাপ কফি দিতে। তিন চামচ চিনি দিতে বলবে। দু' চামচ উঁচু করে, এক চামচ সমান সমান। আর যদি ক্র্যাকার থাকে তাহলে একটা ক্রাকার। মাখন লাগিয়ে দিতে বলবে। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'ফ্রীজ থেকে খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানিও আনবে। আর শোন, পায়ের কাছের জানালাটা একটু বন্ধ করবে ? ঘরে আলো আসছে।'

রূপা এই দীর্ঘ কথাবার্তায় একবারও চোখ মেলল না। মনে হচ্ছে সে ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। রূপার সংঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে গত আষাঢ় মাসে। এখন ফাল্গুন শুরু। প্রায় আটমাস হয়ে গেল। বিয়ের সময় তার মুখ ছিল লম্বাটে। শুধুমাত্র ঘুমিয়ে সেই মুখ এখন সে গোল করে ফেলেছে। গায়ের রঙও মনে হয় আগের চেয়ে ফর্সা হয়েছে। শাদা চাদরের আড়াল থেকে তার একটা পা বের হয়ে আছে। সে পায়ে শাড়ির আব্রু নেই। শঙ্খের মতো ধবধবে শাদা পা। মানুষের পা এত শাদা হয়, রূপাকে বিয়ে না করলে জানতাম না।

'এ্যাই, এ্যাই।'

'বল।'

'পা-টা একটু ঢেকে দাও না।'

রূপা আমার চেষ্টা ছাড়াই তার নগ্ন পা চাদরের ভেতর টেনে নিতে পারে। তা সে করবে না। ঐ যে বললাম বেড়াল স্বভাব। সবার কাছ থেকে আদর নেবে। যত্ন নেবে। আদর পাবার সামান্যতম সুযোগও সে ছাড়বে না।

আমি চাদর দিয়ে তার পা ঢাকলাম। পায়ের কাছের জানালা বন্ধ করলাম। এখন আমার কফি এবং ঠাণ্ডা পানির সন্ধানে যাওয়া উচিত। যেতে পারছি না। রূপার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সব মেয়ে ঘুমুবার সময় চুল বেঁধে ঘুমায়। শুধু রূপার চুল থাকে ছাড়া। বালিশ ময় চুল ছড়ানো, মাঝখানে তার গোলাকার মুখ। সেই মুখ এতই সুন্দর যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অসম্ভব সুন্দর সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের কম। কোনো সুন্দর জিনিসের দিকেই মানুষ বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারে না। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের এ বাড়ির বারান্দা বেশ বড়। আজকালকার আর্কিটেক্টরা এই বারান্দা দেখলে চোখ কপালে তুলে বলবেন, ইশ কতোটা জায়গা নষ্ট করা হয়েছে। কোনো মানে হয়?

এক সময় মুনিয়ার বারান্দায় ফুলের টব বসিয়ে একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল। গোলাপের টব, অর্কিডের টব, এমন কি কাজী পেয়ারার টব। এখন মুনিয়ার টবপ্রীতি দূর হয়েছে। টব আছে, গাছ নেই। বর্তমানে বারান্দা হল আমাদের ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় আসবাব এখানে ডাম্প করা হয়। শুধু আসবাব না, কিছু অপ্রয়োজনীয় মানুষও আমরা বারান্দায় রাখি। এই মুহূর্তে বারান্দার শেষ মাথায় ক্যাম্প খাটে একজন অপ্রয়োজনীয় মানুষ শুয়ে আছেন। তিনি এসেছেন দেশের বাড়ি কেন্দুয়া থেকে। মামলার তদবিরে। ভদ্রলোকের নাম রইসুদ্দিন। আমাদের অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁকে যে আমরা বারান্দায় ফেলে রেখে অপমান করার চেষ্টা করছি, এটা তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করেন। রইসুদ্দিন চাচা আমাকে দেখেই উঠে বসলেন। ছোট-খাটো মানুষ। মামলা মোকদ্দমা করে যেন আরো ছোট হয়ে গেছেন। গালভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি না থাকলে তাঁকে বাচ্চা ছেলের মতোই লাগত। তিনি হাসিমুখে বললেন, আব্বাজীর ঘুম ভাঙল?

তিনি আমাকে ডাকেন আব্বাজী, আমার বোন মুনিয়াকে আম্মা এবং রূপাকে ডাকেন আম্মাজী। আমার সবচে' ছোট ভাই বাবুকে শুধু নাম ধরে ডাকেন। তার বেলায় এই ব্যতিক্রম কেন কে জানে। কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। রইসুদ্দিন চাচার মতো ধুরন্ধর লোক বিনা কারণে কিছু করবেন না। এঁরা প্রতিটি কাজ-কর্ম ভেবে-চিন্তে করেন।

তিনি আগের প্রশ্নই আবার করলেন। এবারে মুখের হাসি আগের চেয়েও বিস্তৃত হল।

'আব্বাজীর ঘুম ভাঙল?'

'জ্বী।'

'ঘুম হইছে কেমন?'

'ভাল।'

'আমারো ঘুম ভাল হইছে। ফুরফুরা বাতাস। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা ঘুম দিলাম । শেষরাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখার পর মনটা আরো ভাল হয়ে গেছে। বড়ই মধুর স্বপ্ন।'

কেউ স্বপ্নের কথা বললে—কি স্বপ্ন দেখা হয়েছে জানতে চাওয়াটা সাধারণ ভদ্রতা। এই মানুষটার সঙ্গে ভদ্রতা করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছে না। তবু অভ্যাসের বসে বললাম, কি স্বপ্ন দেখলেন?

'দেখলাম শাদা একটা সাপ। গ্রামদেশে এই সাপরে বলে দুধরাজ। এই সাপ আমার হাঁটুতে একটা ছোবল দিল। বিষ যা ছিল সব ঢেলে দিল।'

মানুষের কথা শুনে আমি কখনো বিস্মিত হই না। বিশেষ করে এইসব ধুরন্ধর মানুষ কথাবার্তায় সবসময় অন্যদের চমৎকৃত করতে চেষ্টা করে। আমি বুঝতে পারছি রইসুদ্দিন চাচা কথাবার্তায় আমাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখার চেষ্টা করছেন । তিনি হয়তো ভাবছেন আমি অবাক হয়ে বলব—এরকম ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখে আপনার মনটা খুশি হয়ে গেল কেন? তার উত্তরে তিনি আরো চমকপ্রদ কিছু বলবেন। আমি তাঁকে সেই সুযোগ দিলাম না। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। সাপ কামড় দিয়েছে এই স্বপ্ন দেখে কেউ যদি আনন্দে আত্মহারা হয়—হোক। মুখে আবার থুথু জমেছে। এ তো বড় যন্ত্রণা হল!

রান্নাঘরে মুনিয়া ছাঁকনি দিয়ে অর্জুন গাছের রস ছাঁকছে। বাবার কবিরাজী ওষুধ। তাঁর হার্টের কি সব সমস্যা। কবিরাজ বলেছে অর্জুন গাছের ছাল সেদ্ধ করে সেই রস খেতে। অর্জুন গাছের সব ছাল নয়। গাছের পুবদিকের ছাল, যেখানে সূর্যের প্রথম রশ্মি পড়ে। মাখন বলে আমাদের যে কাজের ছেলেটি আছে, তার কাজই হচ্ছে সাইকেলে করে দূর-দূরান্ত থেকে অর্জুন গাছের ছাল নিয়ে আসা। মাখনের কোনো কাজে উৎসাহ নেই। এই কাজটিতে খুব উৎসাহ। সে ঢাকা শহরের আশেপাশের সব অর্জুন গাছের ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছে বলে আমার ধারণা। ছাল-ছাড়ানো অর্জুন গাছ দেখতে কেমন হয়? মাখনার সঙ্গে একদিন দেখে আসতে হবে।

মুনিয়াকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি। মন হয়তো খারাপ। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না। মুনিয়ার মন বেশির ভাগ সময়ই খারাপ থাকে। বছর দুই হল স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা শহরেই থাকেন। তাদের সঙ্গে

দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মুনিয়া ঘর থেকে বের হয় না। ঘরে থেকে থেকে বেচারি ফর্সা হয়ে গেছে।

মুনিয়া অর্জুন গাছের রস ছাঁকতে ছাঁকতে রোবটদের মতো গলায় বলল, ভাবীর ঘুম এখনো ভাঙেনি?

'না। তোকে কফি আর একটা মাখন লাগানো ক্র্যাকার পাঠাতে বলেছে। কফিতে তিন চামচ চিনি। দু' চামচ উঁচু করে আর এক চামচ সমান সমান।'

'আর কিছু?'

'ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি। আইস কোল্ড।'

মুনিয়া মুখ টিপে হাসল। আমিও হাসলাম। মুনিয়া আমার পিঠাপিঠি। ওর সংঙ্গে আমার সহজ সম্পর্কের একটা ব্যাপার আছে। আমি ওর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, মন খারাপ না কি রে?

মুনিয়া হালকা গলায় বলল, বাসিমুখে আমার সামনে বসিস না। দেখেই বমি বমি লাগছে।

আমি নড়লাম না। গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে বললাম, আজ একটা দারুণ ডিসিশান নিলাম।

'কি ডিসিশান?'

'একটা খুন করব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এটা হবে একটা পারফেক্ট মার্ডার। কেউ বুঝতেও পারবে না খুন হয়েছে।'

মুনিয়া মোটেও বিস্মিত হল না। সে যে বিস্মিত হবে না আমি জানতাম। সে ভাবছে আমি রসিকতা করছি। এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত। যে খুন করবে সে সবাইকে বলে বেড়াবে না।

'কাকে খুন করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে।'

'আমার কাছে সাজেশান চাইলে দিতে পারি।'

'কি সাজেশান?'

'রইসুদ্দিন চাচাকে খুন করে ফেল।'

মুনিয়া কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সে আশা করছে আমি বলব, রইসুদ্দিন চাচা কি করেছে?

আমার কাছ থেকে কেউ যা আশা করে, আমি তা করি না। কাজেই কিছুই বললাম না। উদাস চোখে বারান্দায় লাগোয়া সজনে গাছের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সজনে গাছটা মরতে বসেছে। গাছের মৃত্যুও একটা দেখার মতো ব্যাপার। কিছু কিছু

গাছ হঠাৎ করে মরে যায়। ওদেরও মনে হয় হার্ট এ্যাটাকের মতো অসুখ আছে। আবার কিছু কিছু গাছ দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে মরে। এই গাছটা অল্প অল্প করে মরছে। গাছের কোনো ডাক্তার থাকলে তাকে এনে চিকিৎসা করাতাম।

'রইসুদ্দিন চাচা কি করেছেন জানিস?'

'না।'

'মতির মা আমাকে বলল, ওদের যে বাথরুম রইসুদ্দিন চাচাকেও সেই বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। বাথরুমের দরোজায় একটা ফুটো। মতির মা গোসল করছে, হঠাৎ দেখে সেই ফুটো দিয়ে রইসুদ্দিন চাচা তাকিয়ে আছেন। কি রকম ঘেন্নার কথা বল তো!'

'মতির মা কি ওনাকে কিছু বলেছে?'

'না। ভাবছি আমি বলব। অবশ্যি সবচে' ভাল হয় তুই বললে।'

'পাগল, আমি এইসব বলাবলির মধ্যে নেই। খুন করার কথা হলে ভিন্ন কথা।'

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। রুপা এখনো শুয়ে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, কফির কথা বলেছ?

'বলেছি।'

'পানি আননি, ঠাণ্ডা পানি? '

'কফির সঙ্গে আসবে।'

'তাহলে দয়া করে একটা গান দাও তো। গান শুনতে ইচ্ছা করছে। এল.পি.টা দেখো টেবিলের ওপর — 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে', ঐটা দাও।'

আমি তাই করলাম।

রূপা হাসতে হাসতে বলল, গানটা শুনতে শুনতে তোমার পা একটু ধরতে চাই। কাছে এসো তো। ঠাট্টা না, সত্যি। কাছে এসো।

আমি রূপার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রূপা হাসছে। তাকে অসহ্য সুন্দর লাগছে। মানুষ এত সুন্দর হয় কি করে? চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারছি না। গান বাজছে। গানের কথাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে—তবু পুরোপুরি অস্পষ্টও নয়।

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে —
জীবন মরণ সুখ-দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিবো জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কতো আর —
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেল না আমারে ছাড়ায়ে॥

রূপার চোখ বন্ধ। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত হবার জন্যে আমি পর পর দু'বার ডাকলাম, রূপা রূপা। সে সাড়া দিল না। পাশ ফিরল। অথচ ট্রে হাতে

মুনিয়া ঢোকামাত্র রূপা বলল, থ্যাংকস মুনিয়া।

রূপা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছিল না। কিংবা ঘুমের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা ছিল যেন মুনিয়া ঢোকামাত্র সে জেগে যায়। কম্পিউটারাইজড কোন সুইচিং ডিভাইস। রূপা বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, লাবণ্য কি করছে মুনিয়া? ওকে একটু পাঠাবে।

মুনিয়া গম্ভীর মুখে বলল, ও বই নিয়ে বসেছে। ওকে এখন ডেকো না তো ভাবী।

'আচ্ছা, ডাকব না।'

লাবণ্য মুনিয়ার একমাত্র মেয়ে। লাবণ্যর বয়স পাঁচ। সপ্তাহে অন্তত একদিন তাকে তার বাবা দেখতে আসেন। সেই বিশেষ দিনে মুনিয়া তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। সারাদিন কিছুই খায় না।

রূপার সঙ্গে লাবণ্যের অন্য একধরনের ভাব আছে। সেই ভাবের গুরুত্ব এত বেশি, যা মা হিসেবে মুনিয়া ঠিক সহ্য করতে পারে না। মুনিয়া চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য ঘরে ঢুকল। গম্ভীর গলায় বলল, পিরিচে করে চা খাব।

রূপা তাকে পিরিচে চা ঢেলে দিল।

'কেমন আছ লাবণ্য?'

লাবণ্য গম্ভীর গলায় বলল, কি জানি কেমন আছি।

'মনটা কি তোমার খারাপ?'

'হুঁ।'

'কি করলে মন ভাল হবে?'

'জানি না।'

'পিরিচে করে আরো চা খেলে কি ভাল হবে?'

'হুঁ।'

রূপা আরো খানিকটা চা ঢেলে দিল। মুনিয়া আবার ঘরে ঢুকল। এই পর্যায়ে মুখ কালো করে বলল, ভাবী, তুমি ওকে আবার চা দিয়েছ? আমি তোমাকে বলিনি চা খাওয়ানোর অভ্যাস করবে না। এই দেখ, নতুন জামায় চায়ের দাগ লাগিয়েছে।

মুনিয়া মেয়ের হাত ধরে বের হয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জামায় চায়ের দাগ লাগার শোকে সে কেঁদে ফেলবে। আসলেই কাঁদবে। কারণে এবং অকারণে কাঁদা তার শৈশবের অভ্যাস। এখন তার কাঁদার অনেক বিষয় আছে।

আজ শুক্রবার

মা'র হুকুমে শুক্রবার সকালে নাশতা সবাইকে একসঙ্গে খেতে হয়। মা অজিমপুর গার্লস স্কুলে মাস্টারি করেন। মর্নিং শিফটের ক্লাস আটটায় আরম্ভ হয়।

তাঁকে সাতটার মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে রিকশা খুঁজতে হয়। বাবার গাড়ি আছে। তিনি সেই গাড়িতে যাবেন না। বাবার টাকায় নিজের জন্যে কিছু কিনবেন না। সম্ভবত বছর পাঁচেক আগে তাঁদের মধ্যে বড় ধরনের কোনো ঝগড়া হয়েছে। সে ঝগড়ার জের এখনো চলছে। কে জানে হয়তো আরো বছর পাঁচেক চলবে। ঐ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তা ছাড়া ঝগড়ার কারণে তাঁদের কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ না। কাজ চালাবার মতো কথা তাঁরা বলেন।

নাশতার টেবিলে বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন— রইসুদ্দিনের ব্যাপারটা কি বল তো?

মা জবাব দিলেন না। জবাব দেবার অবশ্যি কথাও না। বাবা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন, মতির মা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল, রইসুদ্দিন নাকি বাথরুমের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে ছিল। কি অসম্ভব কাণ্ড!

মুনিয়া বিরক্ত গলায় বলল, ও কি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে নাকি? এটা কি জনে-জনে বলে বেড়াবার মতো কথা?

বাবা বললেন, না বলারই-বা কি আছে? তার ওপর একটা অন্যায় করা হয়েছে, সে বিচার দাবি করবে না? সেই অধিকার কি তার নেই?

মুনিয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে রূপা উঁচু গলায় বলল, বাথরুমের ফুটো দিয়ে মতির মাকে দেখেছে, তাতে হয়েছেটা কি? মতির মা'র শরীর তো পচে যায়নি।

বাবা রূপার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলের বৌ তার মুখের ওপর এরকম কথা বলবে, তা তিনি হয়তো কল্পনাও করেননি। রূপার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বলছে, এই রকম একটা মেয়েকে তুই বিয়ে করলি? রূপা যেন আরো বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে, সে জন্যে টেবিলের নিচে তার পায়ের পাতায় আমি ডান পা নিয়ে চাপ দিলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে "উফ্ কি করছ?" বলে ধমক দিল। আমি হয়ে গেলাম অপ্রস্তুত। রূপা কোনো ব্যথা পায়নি। পুরো ব্যাপারটা সে করল আমাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে।

বাবা বললেন, বাথরুমের ফুটো দিয়ে কোনো মহিলার দিকে তাকানো জঘন্য অপরাধগুলোর একটি। রইসুদ্দিনকে বলতে হবে, সে যেন সকাল এগারোটার আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আর কোনো দিন যেন না আসে। এইসব ন্যুইসেন্সদের বাড়িতে জায়গা দেয়াই ঠিক না।

রূপা বলল, আমার কিছু কথা আছে।

বাবা বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আমি খুব দ্রুত চিন্তা করলাম, আরেকবার পায়ে

চাপ দিয়ে রূপাকে থামানোর চেষ্টা করাটা কি ঠিক হবে? সে অবশ্য আবার "উফ! কি করছ?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে পারে।

মা বললেন, বৌমা, এই বিষয়ে তোমার কিছু বলার দরকার নেই।

'কেন মা?'

'তুমি সব ব্যাপারে কথা বল, এটা ভাল না। তুমি বৌ মানুষ। সংসারের সব কিছুতে তুমি থাকবে কেন?'

'বৌরা কি সংসারের অংশ নয়?'

'অংশ তো বটেই, তবে তারা হচ্ছে সংসারের সৌন্দর্য, সংসারের শোভা। তারা নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, এটা ঠিক না।'

'নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি তো না মা। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, আমার ধারণা মতির মা মিথ্যা কথা বলছে।'

'মিথ্যা কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ রকম ধারণা হবার কারণ কি?'

'রইসুদ্দিন চাচা কিছুদিন আগে বলছিলেন না—তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে মতির মা পঞ্চাশ টাকার একটা নোট সরিয়েছে। মতির মা কান্নাকাটি করল। আপনার হুকুমে মতির মার ট্রাংক্ক খোলা হল। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট সেখানে পাওয়াও গেল।'

'এত ফেনাচ্ছ কেন মা? যা বলতে চাও সহজ কথায় বল।'

'বেশ, সহজভাবেই বলছি। মতির মা সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে, আর কিছুই না। বাহান্ন বছরের এক বুড়ির শরীর দেখার জন্যে কেউ বাথরুমের ফুটোয় চোখ রাখে না।'

কেউ রূপার কথা বিশ্বাস করল কি না জানি না, আমি করলাম। এবং মুনিয়ার ঠোটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সেও করল।

বাবা গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন, বৌমা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মতির মা সত্যি কথা বলছে। কে সত্যি বলছে, কে বলছে না সেটা আমি বুঝতে পারি। তিরিশ বছর জজিয়তি করেছি। তোমাকে আরেকটা কথাও বলি মা, পৃথিবীতে অনেক বিকারগ্রস্ত মানুষ আছে। তারা বাথরুমে ফুটো দেখলেই চোখ রাখবে। রইসুদ্দিন এরকম একজন বিকারগ্রস্ত লোক। তাকে আজ সকাল এগারোটার মধ্যে বাসা ছাড়তে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি আর কারোর কথা শুনতে চাই না।

রূপা বলল, জাজ সাহেব হিসেবে আপনার দু'পক্ষের কথাই শোনা উচিত। আসামীরও তো কিছু বলার থাকতে পারে।

'বৌমা, তুমি আমার সামনে থেকে যাও।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, না বললেও যেতাম। আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।'

রূপা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

এগারোটার আগেই রুইসুদ্দিন চাচাকে তার স্যুটকেস, কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে রিকশায় উঠতে হল। মতির মাকে খুব উৎফুল্ল মনে হল। আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, ভাইজান, দেখছেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ধর্মের কল বাতাসে নড়বে না তো কিসে নড়বে?

'খুবই খাঁটি কথা ভাইজান। খুব খাঁটি কথা। লোকটারে প্রথম দিন দেইখ্যাই বুঝছি বদ লোক।'

'সেও তোমাকে দেখে প্রথমদিনেই বুঝে ফেলেছে, তুমি বদ মেয়েছেলে। দেখ না, এত লোক থাকতে তোমাকে চোর সাব্যস্ত করল। শুধু যে চোর সাব্যস্ত করল তা না, চোর প্রমাণও করে ফেলল। টাকা পাওয়া গেল তোমার ট্রাঙ্কে।'

মতির মা মুখ কালো করে ফেলল।

আমি বললাম, রইসুদ্দিন চাচাকে তুমি চেন না মতির মা। উনি বিরাট ঘুঘু লোক। প্রতি বছর ছয়-সাতটা করে মামলা করে। সে তোমাকে এত সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। মামলা-টামলা করে বসবে বলে আমার ধারণা।

মতির মাকে পুরোপুরি ভ্যাবাচেকা খাইয়ে ঘরে এসে দেখি রূপা চাদর জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। নাশতা খেয়ে আবার বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়া রূপার পুরনো অভ্যাস। প্রথমদিকে অবাক হতাম। এখন আর হই না।

'রূপা ঘুমাচ্ছ নাকি?'

'না, চেষ্টা করছি।'

'তোমার যুক্তি কেউ বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না।'

'সবাই বিশ্বাস করেছে। লোকটাকে তোমরা কেউ সহ্য করতে পারছিলে না। একটা অজুহাত পেয়ে তাড়িয়েছ।'

'তুমি কি লোকটাকে পছন্দ করতে ?'

'আরে দূর দূর। আমি পছন্দ করব কেন? মামলাবাজ লোক আমার অসহ্য। এই, একটা গান দাও না। গান শুনতে শুনতে ঘুমাই।'

'এখন গান দেয়া যাবে না। বাবা গান শুনলেই রেগে যান।'

'রেগে যান কেন?'

'জানি না কেন। ছোটবেলা থেকেই দেখছি গান শুনলে বাবার মেজাজ চড়ে যায়। মুনিয়া একদিন উঁচু ভল্যুমে অনুরোধের আসর শুনছিল বলে চড় খেয়েছিল।'

'তোমার বাবা লোকটাকে আমি খুবই অপছন্দ করি। তিনিও অবশ্যি আমাকে

অপছন্দ করেন। কাজেই কাটাকাটি।'

'মা। মাকে পছন্দ কর?'

'মাই গড। ওনার ভেতর পছন্দ হবার মতো কি আছে?'

'কিছুই নেই?'

'না, কিছুই নেই। এই শোন, একটা গান দাও না। গান শুনতে শুনতে ঘুমানোর অন্য রকম মজা। ঘুমের মধ্যেও গান হতে থাকে।'

'না ঘুমিয়ে একটা কাজ করলে কেমন হয় রূপা?'

'কি কাজ?'

'চল না কোথাও বেড়াতে যাই।'

'পাগল হয়েছ। এই রোদে আমি ঘুরব? গায়ের রঙ নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'বাবাকে বলে গাড়িটা নিয়ে যাই। গাড়িতে গেলে তোমার গায়ের রঙ নিশ্চয়ই নষ্ট হবে না?'

রূপা জবাব দিল না। আমি কয়েকবার ডাকলাম, এই রূপা, এই। কোনো সাড়া নেই। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কি করবো ভেবে পেলাম না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকব, নাকি বাইরে যাব। রূপাকে বিয়ের পর থেকে মোটামুটিভাবে আমি গৃহবন্দী হয়ে পড়েছি। বাইরে যেতে ভাল লাগে না। রূপার আশেপাশে থাকতে ইচ্ছা করে। বেশির ভাগ সময় সে ঘুমিয়ে থাকে। আমি তার পাশে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। রূপার গা ঘেঁষে শোয়া যায় না—তার গরম লাগে। তার গায়ে হাত রাখা যায় না—ভার লাগে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মুনিয়া প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করে বলে—ভাইয়া, তোকে তো ভাবী একেবারে মেষশাবক বানিয়ে ফেলেছে। মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব অবস্থা। মেরী যেখানে যায় মেষশাবক যায় তার পিছু পিছু।

'ও তো যায় না কোথাও। শুয়ে থাকে, ঘুমায়।'

'পাগল হয়েছ ভাইয়া, চব্বিশ ঘণ্টা কেউ ঘুমুতে পারে! আমার ধারণা, ভাবী মোটেই ঘুমোয় না। মটকা মেরে পড়ে থাকে।'

'মটকা মেরে পড়ে থাকবে কেন?'

'তা জানি না। আমি আমার ধারণার কথা বললাম। তুমি হাঁ করে ভাবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাস, এটা ভাবী জানে বলেই চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে, যাতে মনের সাধ মিটিয়ে তুমি দেবীদর্শন করতে পার।'

'চুপ কর তো।'

'চুপ করছি। আমার ধারণা ভুল নাও হতে পারে ভাইয়া। ভাবী যখন ঘুমায়, তখন তুমি ভালমতো পরীক্ষা করে দেখো তো। সত্যি ঘুম কিনা।'

আমি সেই পরীক্ষাও করেছি।

ও যখন ঘুমুচ্ছে তখন পাশে বসে মজার মজার কয়েকটা জোক বলেছি। জেগে থাকলে তাকে হাসতেই হবে। সে হাসেনি। তার ঘুম যে নকল ঘুম না—আসল ঘুম, তা সে না হেসে প্রমাণ করেছে।

মুনিয়াকে আমি আমার এই পরীক্ষার কথা বলেছি। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। তার ধারণা, রূপার হাসি আসেনি বলে হাসেনি। সে বলল, জেগে থাকা অবস্থায় এ রসিকতাগুলো করে দেখো তো—ভাবী হাসে কিনা। আমার মনে হয় হাসবে না।

একদিন তাও করলাম। রূপা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। এমন হাসল যে তার চোখে পানি এসে গেল। হেঁচকি উঠতে লাগল। এই ব্যাপারটাও সন্দেহজনক, এত হাসবে কেন? এত হাসির কি আছে?

রূপা ঘুমুচ্ছে।

আমি তার খাটের পাশে রাখা টুলে বসে তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। এই ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সাধ্যও আমার নেই। আট মাস আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই আট মাসে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ খানিকটা হলেও ফিকে হবার কথা। আমার তা হচ্ছে না — কারণ এই মেয়েটাকে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। প্রথম দিনে সে আমার কাছে যতটা অচেনা ছিল, আজও ঠিক ততটাই অচেনা আছে। কিংবা হয়তো আরো বেশি অচেনা হয়েছে।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

রূপা বলল, আহ্, সিগারেট ফেল তো। গন্ধে বমি আসছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি কি জেগে ছিলে নাকি?

রূপা বিরক্ত গলায় বলল, জেগে থাকব কেন? সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘুম ভেঙেছে। দয়া করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট শেষ করে এসো।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে বারান্দায় চলে এলাম। সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। গাছটা মরে যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে মরছে। এত ধীরে মরছে যে অন্য কেউ তা বুঝতে পারছে না। গাছদেরও কি মৃত্যু-যন্ত্রণা আছে? জগদীশচন্দ্র বসু গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণা নিয়ে কি বলে গেছেন?

আমার সিগারেট শেষ হবার আগেই বাবা বারান্দায় এসে পড়লেন। আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত থেকে সিগারেট ফেলে দিলাম। বাবা রাগী চোখে আমরা দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

সচরাচর বাবাকে তুমি করে বলি। মাঝে মাঝে বিশেষ অবস্থায় আপনি বলি।

বাবা তুই–তুমির মিশ্রণ ব্যবহার করেন, এই তুই এই তুমি।

বাবা বললেন, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথাই আছে।

'এখন বলবেন?'

'না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন, আমার হাতে সময় আছে।'

বাবা ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ বাক্য বললেন যার বাংলাটা হল, মানুষ হিসেবে তুমি দ্রুত বদলে যাচ্ছ। তুমি নিজে তা বুঝতে পারছ কিনা তা আমি জানি না। তবে তোমাকে যতই দেখি ততই শঙ্কিত বোধ করি। তোমার কি রাতে ঘুম হয়?

আমি বললাম, হুঁ।

'হুঁ কোনো জবাব না। ঘুম হয় কি হয় না?'

'হয়।'

'শুনে সুখী হলাম। তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তোর ইদানীং ঘুম হচ্ছে না। লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তোর মধ্যে আত্মসম্মান বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোর স্ত্রী এমন অদ্ভুত আচরণ করল, আর তুই তাকিয়ে রইলি, কিছুই বললি না? তোর কি মনে হয় না — কিছু বলা উচিত ছিল?'

'রূপার কথা আমার কাছে বেশ লজিকেল মনে হয়েছে।'

'লজিকেল মনে হয়েছে?'

'জ্বী।'

'আমার কথাগুলি কেমন মনে হয়েছে? আমার কথাগুলি কি পাগলের চেঁচামেচি বলে মনে হয়েছে?'

আমি জবাব দেবার আগেই রূপা বারান্দায় এসে বলল, তোমরা এত হৈচৈ শুরু করেছ! ঘুমুচ্ছিলাম তো।

বলেই আবার ভেতরে ঢুকে গেল। শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। বাবা হতভম্ব হয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় অনেকদিন এত বিস্মিত হননি। বাবার বিস্মিত চোখ দেখে মজা লাগছে। মানুষ খুব বেশি বিস্মিত হলে খানিকটা টিকটিকির মতো হয়ে যায়। কারণ তার চোখ বড় বড় হয়ে যায় এবং কোটর থেকে খানিকটা বের হয়ে আসে। আমি কি বাবাকে বলব যে তাঁকে এখন কালো টিকটিকির মতো দেখাচ্ছে? বলে আরো রাগিয়ে দেব? চূড়ান্ত রকম রেগে গেলে বাবা কি করেন তা কেন জানি দেখতে ইচ্ছা করছে।

মা'কে একবার চূড়ান্ত রকম রাগিয়ে দিয়েছিলাম। এক সময় লক্ষ করলাম, তিনি থরথর করে কাঁপছেন । ঠোঁটের দুই কোণায় ফেনা জমছে । তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, রঞ্জু, তুই যে খুব খারাপ ধরনের ছেলে, এটা কি তুই জানিস?

আমি মা'র প্রতি একটু করুণাই বোধ করছিলাম। তবু বললাম, আমি যে খুব খারাপ ধরনের ছেলে তা আমি জানি, কিন্তু তুমি যে খুব খারাপ ধরনের একজন মা, তাকি তুমি জান?

'কি বললি? তুই কি বললি?'

'সত্যি কথা বললাম মা।'

'আমি খারাপ ধরনের মা?'

'হ্যাঁ। তুমি খারাপ ধরনের মা এবং খারাপ ধরনের স্ত্রী। মা হিসেবে তুমি যেমন ব্যর্থ, স্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ। আমার ধারণা, শিক্ষক হিসেবেও তুমি ব্যর্থ। স্কুলের মেয়েরা তোমাকে ডাইনী ডাকে। তুমিই এই কথা বলেছিলে। তোমার কাছ থেকেই শোনা।

এই পর্যায়ে মা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। আমি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মা'কে দেখছি। খুব যে খারাপ লাগছে তা না।

মা বললেন, তোর মাথা ঠিক নেই রঞ্জু। তোর মাথা ঠিক নেই। আমার ধারণা, কোনো একদিন তুই খুন-টুন করবি।

আমি মা'র কথায় হেসে ফেললাম। মায়ের এক অর্থে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, তিনি ঠিকই বলেছেন।

আজ ছুটির দিন।

ছুটির দিনে সবার নানান ধরনের পরিকল্পনা থাকে । আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। কারণ আমার ছুটি বলে কিছু নেই। গত দু'বছর ধরেই আমার ছুটি। চাকরি-বাকরি নেই। তার জন্যে চেষ্টাও নেই। ঢাকা শহরে আমাদের যে দু'টি বাড়ি আছে, তার ভাড়াতে আমরা একটা জীবন মোটামুটি সুখে পার করে দিতে পারি। এখন যে বাড়িতে আছি, এটা ভাড়া বাড়ি। বাবার বন্ধুর বাড়ি। শুনতে পাচ্ছি এটিও নাকি কেনা হবে। বাবা মৃত্যুর সময় তিন বাড়ি তাঁর তিন পুত্র-কন্যাকে দিয়ে যাবেন।

সবচে বড় বাড়ি ধানমণ্ডি তের নম্বরের 'গ্রীণ কটেজ' পাবে বাবু। সব পরিবারে একজন আদর্শ সন্তান থাকে, বাবু হচ্ছে সেই আদর্শ সন্তান। এম. এসসি. দিচ্ছে ফিজিক্সে। নির্ঘাৎ ফার্স্ট সেকেণ্ড হবে। বাবু হচ্ছে সেই ধরনের ছেলে, যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড ছাড়াও যে কিছু হওয়া যায় তা জানে না। এরা ছুটির দিনেও দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে। বাথরুমে যাবার সময়ও বগলে করে পড়ার একটা বই নিয়ে যায়। ঈদের দিন ভোরবেলা বিস্মিত হয়ে বলে—আজ ঈদ? জানতাম না তো? কি আশ্চর্য!

বাবু চিলেকোঠার একটা ঘরে থাকে, এবং তাকে বিরক্ত করা নিষেধ। ঘরে বসে পড়তে পড়তে তার যখন মাথা ধরে যায়, তখন সে বই হাতে ছাদে ঘুরে ঘুরে পড়ে। তখন ছাদে কেউ থাকলে সে বিরক্ত গলায় বলে, এইখানে কি?

আমি বাবুর ঘরে চলে গেলাম। বাবু বই হাতে বিছানায় শুয়ে ছিল। সে বিরক্ত গলায় বলল, কি চাও দাদা?

আমি হাই তুলে বললাম, তোর কাছে একটা পরামর্শের জন্যে এসেছি।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে কি পরামর্শ!

'তোর কাছে কি পরামর্শের জন্যে আসা যায় না? সারা জীবন ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়েছিস—তোদের ব্রেইন হচ্ছে কম্পিউটারইজড। সমস্যার খটাখট সমাধান করে ফেলবি।'

বাবু আগের চেয়েও বিরক্ত গলায় বলল, দাদা, মানুষের ব্রেইন কম্পিউটারের চেয়ে কোটিগুণ পাওয়ারফুল। কম্পিউটার মানুষের তৈরি এটা ভুলে যাও কেন?

'সবার ব্রেইন তো আর পাওয়ারফুল না। কিছু কিছু ব্রেইন আছে ইটের টুকরার মতো। সলিড রক।'

'তোমার সমস্যাটা কি দাদা অল্প কথায় বলে চলে যাও। আমি জটিল একটা বিষয় পড়ছি — নন নিউটোনিয়ান ফ্লো প্যাটার্ন . . .'

'আমি বসতে বসতে বললাম, একটা খুন করতে চাচ্ছি, বুঝলি — পারফেক্ট মার্ডার। কিভাবে করব বুঝতে পারছি না।'

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না । ঠাট্টা করব কেন। তুই ভেবেটেবে একটা কায়দা বের কর তো।'

'কাকে খুন করবে?'

'আন্দাজ কর তো।'

'রূপা ভাবীকে?'

'ঠিক ধরেছিস।'

'রূপা ভাবীকে খুন করবে কেন?'

'আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, এত মানুষ থাকতে তোরই বা রূপার কথা মনে হল কেন?'

বাবু থতমত খেয়ে গেল। আমি উঠতে উঠতে বললাম, খুব ভালমতো চিন্তা-ভাবনা করে তারপর আমাকে বলবি। হুট করে কিছু বলবি না। খুনটা হবে টেক্সট বুক মার্ডার। কোনো রকম ভুলচুক থাকবে না।

বাবু বিড়বিড় করে বলল, তোমার মাথা আগেও খারাপ ছিল এখন আরো বেশি

খারাপ হয়েছে। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। দাদা, তুমি কি ড্রাগ-ট্রাগ কিছু খাও?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, খাই না, তবে খেয়ে দেখব বলে ভাবছি। ইন্টারেস্টিং ড্রাগ কি আছে বল তো।

আমাদের পরিবারের 'আদর্শ মানব' বাবু বিরক্ত মুখে বই পড়তে শুরু করেছে — নন নিউটোনিয়ান ফ্লো মেকানিক্স। অতি জটিল বিষয়, সে নিশ্চয়ই জলের মতো বুঝতে পারছে। তবে সহজ জিনিস সে কিছু বোঝে না বলেই আমার বিশ্বাস। বাবু ভুরু কুঁচকে বলল, দাদা, এখন যাও তো। মূর্তির মতো বসে আছ, আমার খুব বিরক্ত লাগছে।

আমি উঠে পড়লাম। আদর্শ মানবকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করা ঠিক না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখি, লাবণ্যও নামছে। চুল বেঁধে, মুখে পাউডার দিয়ে একেবারে পরীদের ছানা। পায়ে লাল ভেলভেটের জুতা। আমি বললাম, এমন সেজেছিস কেন রে লাবণ্য?

লাবণ্য হাসিমুখে বলল, বাবা আমাকে দেখতে এসেছে।

'ও আচ্ছা। খুব আনন্দ হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'একা একা বাবার কাছে যেতে পারবি, নাকি আমাকে সঙ্গে যেতে হবে?'

'একা যেতে পারব।'

লাবণ্য রেলিং ধরে খুব সাবধানে নামছে। এই সাবধানতা তার নতুন জুতার জন্যে।

আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। লাবণ্যর বাবার গাড়ি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। গাড়িতে রোগামতো একটি মেয়ে বসে আছে। এই বোধহয় ভদ্রলোকের নতুন স্ত্রী। মেয়েটা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বৌ বৌ ভাব নিয়ে এসেছে।

আমি আবার আমার ঘরে ঢুকলাম। আমাদের বিছানায় মুনিয়া উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুনিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বসে আছে রূপা। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রূপা তীব্র স্বরে বলল, 'প্লীজ লিভ আস এলোন।'

এই ইংরেজি বাক্যটির সুন্দর বাংলা কি হবে — 'দয়া করে আমাদের একা থাকতে দাও' — নাকি 'পায়ে পড়ি আমাদের একা থাকতে দাও?'

২

রূপার সঙ্গে কি করে পরিচয় হল সেটা বলি।

আমার ছেলেবেলার বন্ধু সফিক। ভুল বললাম, বন্ধু বলে আমার কেউ নেই। যাদের আমি খানিকটা সহ্য করতে পারি তাদেরই বন্ধু বলার চেষ্টা করি। স্কুলে এবং কলেজে যাদের সঙ্গে আমি পড়েছি তাদের মধ্যে একমাত্র সফিককেই খানিকটা সহ্য করতে পারি। তাও সব সময় নয়, মাঝে মাঝে। সে গত বছর ডাক্তারি পাশ করেছে। এখনো বেকার। ডাক্তারাও যে বেকার থাকে তা সফিকের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কোনোদিনও জানতাম না। তাকে ইদানীং দেখায় একজন লেখকের মতো। তার চুল লম্বা। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে টায়ারের সোল লাগানো স্যাণ্ডেল। তাকে সারাক্ষণই খুব উত্তেজিত দেখা যায়। এক জায়গায় বসে একটা দীর্ঘ বাক্য সে বলতে পারে না, লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। আবার বসে।

একদিন সফিক এসে বলল, চট করে শার্টটা গায়ে দে তো — কুইক।

আমি বললাম, কেন?

'পৃথিবীর সবচে রূপবতী মেয়েটিকে দেখবি। হেলেন অব ট্রয় এই মেয়ের কাছে মাতারি শ্রেণীর।'

আমি চুপ করে রইলাম। হেলেন অব ট্রয় যে মেয়ের তুলনায় মাতরি তাকে দেখার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছা করছে না।

'দেরি করিস না। চট করে কাপড় পর।'

'না।'

'না মানে? আমি ঐ মেয়েকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার করে যেতে পারি, আর তুই একদিন যেতে পারবি না?'

'তুই প্রতি সপ্তাহে যাস?'

'অফকোর্স যাই। ইন্সপাইরেশনের জন্যে যাই। আমি লেখালেখির লাইন ধরব বলে ঠিক করেছি । উপন্যাসের ওয়ান ফোর্থ লিখেও ফেলেছি। রূপাকে পড়ে শোনালাম। রূপা বলল, ব্রিলিয়ান্ট!

'রূপাটা কে? ঐ রূপবতী?'

'হুঁ। চল যাই। আজও খানিকটা পড়ব—তুই শুনতে পারবি।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, উপন্যাস পড়তে বা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

'না লাগলেও চল। একটা রিকোয়েস্ট রাখ। একা যেতে ইচ্ছা করছে না।'

পুরানো ঢাকার যে বাড়ির সামনে নিয়ে সফিক আমাকে দাড়া করালো তার নিতান্তই ভগ্নদশা। রাজকন্যারা এ জাতীয় বাড়িতে থাকে না। দোতলা বাড়ি। একতলার সব ক'টা দরজা-জানালা বন্ধ। একতলাটা মনে হয় বসতবাড়ি না, দোকানপাট। একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে — নিউ হেকিমী দাওয়াখানা। রেলিংঘেরা উঠানে পিয়াজুর দোকান। পিয়াজু ভাজা হচ্ছে। দোতলায় উঠার সিঁড়ি লোহার। সেই সিঁড়ি যে এতদিনেও ভেঙ্গে পড়ে যায়নি কেন কে জানে। শুধু সিঁড়ি না, পুরো বাড়িটাই ছোটখাট ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করছে। সিঁড়ির গোড়ায় কলিং বেল আছে। সফিক অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল টেপাটিপি করতে লাগল। বেল বাজছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। আমি কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। সফিক হাসিমুখে বলল, অনেকক্ষণ ধরে বেল টেপাটিপি করতে হয়।

বেল বাজাতে বাজাতে সফিক যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন ন'দশ বছরের একটি ছেলে নামল। যাকে দেখেই মনে হল অসুস্থ। চোখ-মুখ ফোলা।

'কারে চান?'

'রূপা আছে? আমরা রূপার বন্ধু।'

'নাম কি?'

'আমার নাম বললেই হবে। গিয়ে বল সফিক।'

আমরা দোতলায় উঠলাম না। একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সফিক বলল, একতলায় রূপার নিজের একটা ড্রয়িং রুম আছে। খুব সুন্দর করে সাজানো। টেলিফোন আছে, টিভি, ভিসিআর সবই আছে। রূপার বাবা মেয়ের যা লাগে সব দিয়ে রেখেছেন।

'এটা তাহলে রূপাদের বাড়ি না?'

'আরে না। এটা রূপার এক চাচার বাড়ি।'

'তাদের নিজেদের বাড়ি নেই?'

'আছে। সেই বাড়ি সারা বছর তালাবন্ধ থাকে। রূপার বাবা এক বছরে এগার মাস থাকে বাইরে। একটা মেয়ে তো আর একা একা থাকতে পারে না।'

'এগার মাস বাইরে কি করে?'

'ব্যবসা-ট্যাবসা করে বোধহয়। বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কও ভাল না। অবশ্যি আমার আন্দাজ। আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

অন্য একটা ছেলে এসে একতলার একটা রুম খুলে দিল। সফিকের কথাই সত্যি। গা ছমছমানো ড্রয়িং রুম। সেখানের সাজসজ্জা এমন যে কিছুতেই পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি বসা সম্ভব না। পুরো দেয়ালজুড়ে অনেক পেইনটিং । সবই বিদেশি

ল্যাণ্ডস্কেপ। চেরী গাছ, সামার হাউস, স্লো ফল. . .

সফিক বলল, ছবিগুলি দেখছিস?

'হুঁ।'

'ভাল করে দেখে রাখ, পরে এই সম্পর্কে বলব। মনে করিয়ে দিস। আজকাল কিছু মনে থাকে না। প্রায়ই ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে যায়।'

আমরা বসে আছি। সফিক নিচু গলায় বলল — রূপা যদি সত্যি সত্যি নেমে আসে, তাহলে ট্যারা হয়ে যাবি। আই ডিফেক্ট হয়ে যাবে। এরকম মেয়ে চোখে দেখতে পাওয়াও বড় ধরনের অভিজ্ঞতা। তবে নেমে আসে কিনা সেটাও একটা কথা। মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ থাকে। তখন দোতলা থেকে নামে না।

আমি বললাম, এতো বিরাট অপমানের ব্যাপার!

সফিক বলল, দূর দূর, অপমানের কিছু না। রূপার স্বভাবই এরকম। পরিচয় হলেই তুই বুঝবি।

'যখন দেখা করে না, তখন কি করিস?'

'চা-টা খেয়ে চলে যাই। কি আর করব। রূপার একটা ভাল গুণ কি জানিস? কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এলেই চা দিতে বলে। দেখা করুক আর না করুক। চায়ের সঙ্গে সমুচা থাকে। অপূর্ব! রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো। শেষ হয়েও শেষ হয় না, জিভে স্বাদ লেগে থাকে।'

'মেয়েটা দেখা করে না। তারপরেও তুই এখানে আসিস?'

'হুঁ। এত সুন্দর মেয়ে, খানিকক্ষণ কথা বললে মনটা ভাল হয়ে যায়। তাই আসি। এখানে এলে লেখার একটা ইন্সপিরেশন হয়। লেখকদের জন্যে ইন্সপিরিশন খুব দরকার। ইন্সপিরিশনের জন্যে একজন লেখক যা ইচ্ছা করতে পারে। ইট ইজ এ্যালাউড।'

রূপা নামল না। তবে একজন কাজের ছেলে ট্রেতে করে চা এবং সমুচা নিয়ে এল। সফিক বলল, তোকে বলেছিলাম না চা চলে আসবে। অবশ্যি এটা খারাপ সাইন। তার মানে রূপা নামবে না। চা খা। চা খেয়ে চলে যাব। এই সমুচাগুলি এ বাড়ির স্পেশাল। ভেরি ভেরি গুড। খেয়ে দেখ।

চা শেষ করবার আগেই রূপা নেমে এল। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। জীবনে এত অবাক হইনি। মানুষ এত সুন্দর হয়! সফিক নিচু গলায় বলল, বলেছিলাম না ট্যারা হয়ে যাবি ? এইভাবে তাকিয়ে থাকিস না, চোখে লাগছে। খুব ক্যাজুয়েলি তাকিয়ে থাক। যেন কিছুই না।

রূপা সফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, কোনো কাজে এসেছেন, না চা সমুচা খাবার জন্যে এসেছেন?

'কাজে এসেছি।'

'বলে ফেলুন। আমি খুব বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না ।'

সফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমি আমার এই বন্ধুকে বলেছিলাম—এমন একজন মেয়ের কাছে তাকে নিয়ে যাব যাকে দেখলেই তার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

রূপা আমার দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, আপনার চোখ কি ট্যারা হয়েছে?

আমি কিছু বললাম না। তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি সফিকের কথায় মোটেও বিব্রত বোধ করছে না । আমার দিকে তাকিয়ে আছে অসঙ্কোচে। সে আমার দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, আচ্ছা আপনি কি কবি?

আমি বললাম, না।

'বাঁচালেন। কবি হলে খানিকটা সমস্যা হত।'

বলেই সে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগ্রহের কারণ, সে অপেক্ষা করছে আমি জিজ্ঞেস করব—কি সমস্যা? আমি তা করলাম না। রূপা বলল, কি সমস্যা জানেন? কবি হলেই পরের দিন আপনি আবার আসতেন, পকেটে থাকত কবিতা। সেই কবিতা আমাকে নিয়ে লেখা। আমাকে শান্তমুখে সেই কবিতা শুনতে হত। এবং আবেগজর্জরিত কবিকে সমুচা খাওয়াতে হত। আপনি কি সমুচা খেয়েছেন?

'হুঁ।'

'কেমন লাগল?'

আমি জবাব দিলাম না। রূপা বলল, সফিক সাহেবের মতে সমুচাগুলি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো। আমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়িনি, কাজেই বলতে পারছি না ব্যাপারটা কি? আপনি কি পড়েছেন?

'একটা পড়েছি।'

'শুধুই একটা?'

'হুঁ, হৈমন্তী। পাঠ্য ছিল।'

সফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, মজার ব্যাপার কি জান? হৈমন্তী গল্পটা রঞ্জুর মুখস্থ। দাড়ি সেমিকোলনসহ।

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, সত্যি। তার যখন কিছু পছন্দ হয় সে মুখস্থ করে ফেলে। সে রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প পড়েছে, কিন্তু সেটা তার মুখস্থ।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না — সত্যি?'

আমি জবাব দিলাম না। সফিককে বললাম, চল উঠি।

রূপা আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, এখনই উঠবেন কি। বসুন। আরেক কাপ চা খান। হৈমন্তী গল্পটা মুখস্থ বলুন। প্লীজ। প্লীজ। বাসায় গল্পগুচ্ছ আছে, আমি বই নিয়ে মিলিয়ে দেখব। যদি সত্যি সত্যি পারেন তাহলে . . .

'তাহলে কি?'

রূপা হাসতে হাসতে বলল, তাহলে আপনার জন্য একটা প্রাইজ আছে।

সফিক বলল, ও পারবে, ওর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভাল। আমার বরাবরই খারাপ ছিল। এখন আরো খারাপ হয়েছে। প্রায়ই ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে যায়।

রূপা গল্পগুচ্ছ নিয়ে এল। হৈমন্তী গল্প বার করা হল। আমি রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলাম — "কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে। কিন্তু পণের টাকার অপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যেই তাড়া। . . . "

রূপা বলল, থামুন। আপনি ভুল করেছেন — 'এখনো তাহার' এই দু'টা শব্দ বাদ পড়েছে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যেই তাড়া।

আমি চুপ করে গেলাম। রূপা বলল, থামলেন কেন?

আমি বললাম, আজ আর ইচ্ছা করছে না। আরেকদিন।

রূপাদের বাড়ি থেকে বের হয়েই সফিক বলল, কি, আমার কথা ঠিক হয়েছে? দেখেছিস এমন রূপবতী মেয়ে?

আমি বললাম, না, দেখিনি।

'মেয়েটার চোখ নীল, তা লক্ষ করেছিস?'

'হুঁ।'

'চোখ নীল কেন বল তো?'

'আমি কি করে বলব?'

'রূপার মা হচ্ছেন লেবানীজ মেয়ে। মেয়ে তার মা'র রূপ পেয়েছে। চোখ এই কারণেই নীল ড্রয়িং রুমে যে সব ছবি দেখেছিস, সবই ওর মা'র আঁকা।'

রূপার সঙ্গে পরিচয়ের এই হচ্ছে শুরু। রূপার চাচার সঙ্গে কথা হয়েছে। ভদ্রলোক রোবট জাতীয়। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, কিছুক্ষণ পর খুব দ্রুত

খানিকক্ষণ চোখ পিটপিট করেন, তারপর আবার তাকিয়ে থাকেন। কথাবার্তা বলেন না, বললেও এক অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকে। রূপা যখন বলল, চাচা, ইনার নাম রঞ্জু।

রোবট চাচা বললেন, হুঁ।

'উনি হলেন সফিক সাহেবের বন্ধু। সফিক সাহেবকে তো তুমি চেন, চেন না?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে চাচা, তুমি এখন যাও। এরা দু'জন এসেছেন ভি সি আরে একটা ছবি দেখতে — এ্যামেডিউস।'

'হুঁ।'

আমি বললাম, এই যে আমরা প্রায়ই আসি আপনার চাচা বিরক্ত হন না?

'অবশ্যই হন। তবে বিরক্ত হলেও কিছু বলেন না, কারণ আমাকে তার বাড়িতে রাখার জন্য তিনি মাসে দশ হাজার করে টাকা পান এবং বাবা তাঁকে বলে দিয়েছেন — আমাকে যেন আমার মত চলতে দেয়া হয়। চাচার ভয়ঙ্কর মানসিক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তিনি আমাকে আমার মত চলতে দিচ্ছেন।

মোট কবার গিয়েছি রূপাদের বাড়িতে? অনেকবার। তবে কখনো একা যাইনি। সব সময় সফিক সঙ্গে ছিল। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতিবারই রূপা বলেছে — দেখি আপনার স্মৃতিশক্তি কেমন, হৈমন্তী গল্পটা আবার বলুন তো। আমি মিলিয়ে দেখি। একটা না একটা ভুল আপনি প্রতিবারই করেছেন। যেদিন কোনো ভুল করবেন না সেদিন আপনার জন্যে পুরস্কার আছে।

'কি পুরস্কার?'

'তা বলব না। তবে খুব ভাল পুরস্কার। যা আপনি কখনো কল্পনাও করেন নি।'

সফিককে বাদ দিয়ে একবার আমি গেলাম একা । আমাকে একা দেখে রূপা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল।

'কি ব্যাপার, একা যে! বন্ধু কোথায়?'

আমি বললাম, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি, কাজেই একা।

রূপা আগের চেয়েও বিস্মিত হয়ে বলল, কি প্রয়োজন?

'হৈমন্তী গল্পটা ভুল ছাড়া আপনাকে শোনাব ।'

'ও আচ্ছা।'

'গল্পগুচ্ছ নিয়ে আসুন।'

'গল্পগুচ্ছ আনতে হবে না। আজ যে আপনি ভুল করবেন না তা আপনার চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আপনাকে একটা চমৎকার পুরস্কার দেব বলেছিলাম। তা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। পুরস্কারটা কি আপনি কি আন্দাজ

করতে পারেন?

'না, আমি আন্দাজ করার চেষ্টাও করিনি। কারণ আপনি বলেছিলেন পুরস্কারটা কি তা আমি কল্পনাও করতে পারব না।'

রূপা বলল, কিছু কল্পনাতো তারপরেও করেছেন। করেননি?

'না।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'বসুন চা খাই আগে, তারপর কথা হবে। আমি যে একটা সিনেমা করছি তা কি আপনি জানেন?'

'জানি — সফিক বলেছে। সজনে ফুল।'

'আজ সেই ছবির কিছু কাজ হবে বুড়িগঙ্গা নদীতে। বিকেল তিনটা থেকে শিফট। আপনি কি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অনেক লোকজন সেখানে থাকবে। এত লোকজন আমার ভাল লাগে না।'

'কি জন্যে লোকজনদের ভিড় আপনার ভাল লাগে না? লোকগুলিকে আপনার কি বোকা মনে হয়, না বেশি বুদ্ধিমান মনে হয়?'

'বোকা মনে-হয়।'

রূপা হেসে ফেলল। নিজেই চা নিয়ে এল। টী পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আপনাকে যেমন বলেছি — "এমন সুন্দর একটা উপহার দেব যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।" সে রকম কথা আমি অন্য পুরুষ মানুষদেরও বলেছি। এটা বললে পুরুষদের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন দেখতে আমার ভাল লাগে।

'কাউকে কি পুরস্কার দিয়েছেন?'

'না। বাজি এমন বিষয়ে ধরি যা পূরণ করা সম্ভব না। মুতালেব নামে আমার একজন বন্ধু আছে, তাকে একটা অঙ্কের ধাঁধা দিয়েছি। সে এক বছর ধরে সেই ধাঁধার জবাব বের করার চেষ্টা করছে — বিশেষ পুরস্কারের আশায়, যে পুরস্কারটা কি তা সে জানে না।'

'বের করতে পারেনি?'

'কোনদিন পারবেও না। এই ধাঁধাটার কোনো উত্তর নেই। তবে আপনি পারবেন। আপনার চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছে আপনি তৈরি হয়ে এসেছেন। তবে আজ হাতে একেবারেই সময় নেই। কোনো একদিন আপনাকে খবর দেব। বাসায়

কি আপনার টেলিফোন আছে? থাকলে নাম্বারটা রেখে যান।

তারপর একদিন অদ্ভুত এক ব্যাপার হল। দুপুরে ঘুমিয়ে আছি — মুনিয়া এসে ডেকে তুলল, টেলিফোন। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ঘুমুচ্ছি বলতে পারলি না?

'দিনে তো তুই কখনো ঘুমাস না। কাজেই ভাবলাম বোধহয় মটকা মেরে পড়ে আছিস।'

'কে টেলিফোন করেছে?'

'নাম জিজ্ঞেস করিনি, তবে গলার স্বর অসম্ভব মিষ্টি। আমি এরকম মিষ্টি গলার স্বর এর আগে শুনিনি।'

আমি টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে রূপা বলল, আপনার কি ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি আছে? শাদা পাঞ্জাবি?

'কেন?'

'আছে কিনা বলুন।'

'আছে।'

'পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে চলে আসতে পারবেন?'

'পারব, কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'আপনাকে বিয়ে করতে হবে।'

'বিয়ে করতে হবে মানে?'

'অসহায় একজন তরুণীকে উদ্ধার করতে হবে। কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা ধরনের ছেলে জোর করে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। তাদের একজন মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি, এই যুগে এটা কি সম্ভব?

'এই যুগেই সম্ভব। অন্য যুগ হলে সম্ভব ছিল না।'

'পুলিশে খবর দিতে বলুন।'

'পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশ ছেলের নাম শুনে পিছিয়ে গেছে। পুলিশ বলছে, এখনো তো কিছু ঘটেনি। ঘটলে দেখা যাবে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তো আমরা এ্যাকশান নিতে পারি না। এখন আপনি ভরসা।'

'আপনার কি করে ধারণা হল অমি অসহায় তরুণীদের উদ্ধারের ব্রত নিয়েছি?'

'তরুণীর নাম শুনলে আপনি খুব আগ্রহ করে এই ব্রত নেবেন বলে আমার ধারণা।'

'কি নাম?'

'তার নাম রূপা।'

আমি প্রথমে ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই রূপার কঠিন কোনো রসিকতার একটি।

তারপর মনে হল রূপা তো কখনো রসিকতা করে না। অন্যের রসিকতায় খিলখিল করে হাসে — নিজে তো কখনো করে না। রূপা তরল গলায় বলল, মনে হচ্ছে কথা শুনে পাথর হয়ে গেছেন?

'বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'শুনুন, খুব মন দিয়ে শুনুন। আমার তালিকায় তিনটি নাম আছে। আপনি হচ্ছেন দু'নম্বর। প্রথমজনকে টেলিফোনে পাইনি, ওদের টেলিফোন নেই। কাজেই আপনাকে টেলিফোন করলাম। আপনার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেলাম। আপনি যদি রাজি না থাকেন, স্পষ্ট গলায় বলে দিন। আমি তৃতীয়জনকে টেলিফোন করবো।

'ঠাট্টা করছেন?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

'প্রথমজনের নাম কি?'

'প্রথমজনকে আপনি চেনেন না। প্রথমজনের নাম জেনে কোনো লাভ নেই। তৃতীয়জনকে চেনেন, কিন্তু তার নামটা বলতে চাচ্ছি না। আপনাকে চিন্তা করার জন্য আধঘণ্টা সময় দিলাম। যদি রাজি থাকেন তাহলে আধঘণ্টা পর আমাদের বসায় চলে আসবেন।'

'বিয়ে কি আপনাদের বাসায় হবে?'

'তা কি করে হয়! আমাদের বাসার চারদিকে মস্তান ঘুরঘুর করছে। সন্দেহ হলেই ককটেল ফোটাবে। ব্রাস ফায়ার করবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'এক রত্তি বানিয়ে বলিনি। আপনি যদি রাজি থাকেন চলে আসুন। আমি ইতিমধ্যে পুলিশকে টেলিফোন করছি। পুলিশের এক এআইজি আছেন বাবার বন্ধু। তাঁকে বলব — চাচা, আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন।'

'আপনার বাবা? উনি কোথায়?'

'বাবা ইংল্যাণ্ডে। তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে।'

'উনি কি রাজি?'

রূপা হাসতে হাসতে বলল, আমি তো তাঁর কোনো মতামত চাইনি। ঘটনা বলেছি — এখন বলুন আপনি কি রাজি?

'আমি রাজি আছি।'

'এতো চট করে রাজি হবেন না। আধঘণ্টা সময় নিন। রাখি, কেমন?'

পুলিশের উপস্থিতিতে বিয়ে হল রূপাদের চাচার বাসায়। বিয়ের পর পুলিশের

জীপে করেই আমরা বেরুলাম।

রূপা বলল, এখন থেকে তোমাকে তুমি করে বলব। শোন, আমার কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে, টুথব্রাশ, চিরুনি, ঘরে পরার শাড়ি । তোমার কাছে কি টাকা আছে?

'না।'

'অসুবিধা নেই। আমার কাছে আছে। নতুন স্বামীরা স্ত্রীর টাকায় কিছু কিনতে চায় না বলেই জানতে চেয়েছি।'

'আমাকে নিয়ে তুমি সারাসরি তোমার বাসায় তুলবে?'

'হুঁ।'

'অসুবিধা হবে না তো? চিন্তা করে দেখ।'

'অসুবিধা হবে না।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অসুবিধা হবে। তুমি বরং টেলিফোনে আগে কথা বলে নাও। ওরা খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাক।'

'টেলিফোন করার দরকার নেই ।'

রূপাকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলাম রাত আটটার দিকে। রূপার বাবার বন্ধু এআইজি খালেকুর রহমান পুলিশের জীপে আমাদের নামিয়ে দিলেন।

রাত সাড়ে ন'টায় বাবার একটা মাইল্ড স্ট্রোক হল। আমার বাসর রাত কাটল সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে।

আমি একা না, বাবুও সঙ্গে হাঁটছে। তাকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে। বড় ভাই হিসেবে সে আমাকে খানিকটা সমীহ করত, সামনে সিগারেট খেত না। আজ সে সব কিছুই বোধহয় মনে নেই। তবে আমার ধারণা, বাবাকে নিয়ে সে যতটা না চিন্তিত তার চেয়েও বেশি চিন্তিত যে আজ রাতটা নষ্ট হল। রাতটা কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু সে নিশ্চয়ই পড়ে ফেলত নন নিউটোনিয়ান ফ্লো না কি যেন বলে ঐ সব।

'দাদা।'

'হুঁ।'

'বিরাট ঝামেলা হয়ে গেল মনে হচ্ছে।'

'পড়াশোনার ক্ষতির কথা বলছিস?'

'সেই ঝামেলা তো আছেই। অসুখ-বিসুখ, হাসপাতাল-বাসা ছোটাছুটি। তার উপর তুমি আবার হুট করে বিয়ে করে ফেললে। ঐ নিয়ে বাড়িতেও নিশ্চয় টেনশন থাকবে।'

'তা কিছুটা থাকবে।'

বাবু সিগারেট ধারতে ধরাতে বলল, তুমি এই ঝামেলাটা আমার পরীক্ষার পরে করলেও পারতে। মারাত্মক একটা ডিসটার্বেন্স হবে পড়াশোনায়। ভাবী নিশ্চয়ই ছাদে ঘুরঘুর করবে। মেয়েদের একটা টেনডেসিই থাকে ছাদে যাওয়া। কারণে–অকারণে ছাদে যাবে।

'আমি নিষেধ করে দেব।'

'ইমমেডিয়েটলি কিছু বলার দরকার নেই। কয়েকটা দিন যাক। বাবার অবস্থা তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?'

'এ যাত্রা টিকে যাবেন বলে মনে হয়।'

বাবু শুকনো মুখে বলল, সব ক'টা ঝামেলা পরীক্ষার আগে শুরু হল। ধর ভাল–মন্দ কিছু যদি হয়, তাহলে এক মাস আর বই নিয়ে বসা যাবে না। আত্মীয়স্বজন... বিশ্রী অবস্থা হবে . . . আজকের পুরো রাতটা নষ্ট হল। কাল দিনটাও নষ্ট হবে।

'কাল দিনটা নষ্ট হবে কেন?'

'রাত দু'টা থেকে ভোর সাড়ে সাতটা — এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা না ঘুমালে দিনে পড়তে পারি না। মাথা জাম হয়ে থাকে। এখন বাজে তিনটা। এক ঘণ্টা তো চলেই গেল। বিরাট সমস্যা।'

'সমস্যা তো বটেই।'

'আমরা এখন কি করব? বাকি রাত হাসপাতালের বারান্দাতেই হাঁটাহাঁটি করে কাটাব?'

'হুঁ।'

বাবু বিরক্ত মুখে বলল, আমরা হাঁটাহাঁটি করে তো বাবাকে কোন ভাবে হেল্প করতে পারছি না। লাভটা কি হচ্ছে?'

'তুই কি চলে যেতে চাচ্ছিস?'

'আমি চলে গিয়েই বা করব কি? বাসায় ফিরতে ফিরতে ধর রাত সাড়ে তিনটা বেজে যাবে . . . তারপর কি আর রেস্ট নেবার সময় থাকবে?'

আমি বললাম, চল চা খেয়ে আসি। হাসপাতালের আশেপাশে চায়ের দোকান সারা রাত খোলা থাকে। বাবু বিরস মুখে বলল, চল।

চা খেতে খেতে বাবু বলল, মুনিয়া বলছিল, তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছ সে নাকি দারুণ রূপবতী।

'তুই এখনো দেখিস নি?'

'না। ভাবীকে নিয়ে তুমি যখন এলে তখন আমি ফ্রী পার্টিকেল প্রবলেম সলভ করছিলাম — নিচে নামতে ইচ্ছা করল না।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার

উপকারিতাটা কি তুই আমাকে বল তো দেখি।'

বাবু বিস্মিত মুখে বলল, তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না। ঠিক কি জানতে চাচ্ছ বুঝিয়ে বল তো।

'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। কথার কথা। চল খোঁজ নিয়ে দেখি। বাবার কি অবস্থা?'

বাবার অবস্থা ভালই। বাবা সামলে উঠেছেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, হার্টের কিছু না। হঠাৎ ব্লাড প্রেসার সুট করেছে, তাই এ অবস্থা।

বাবার কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ, তবু তিনি ক্ষীণ গলায় আমাকে বললেন, এই কাজটা তুই কি করে করলি? শাদা চামড়া দেখে সব ভুলে গেলি? কি আছে শাদা চামড়ায়? বল তুই, কি আছে?

'কিছু নেই।'

'সুন্দর চেহারা? কি হয় সুন্দর চেহারায় তুই বল।'

'কিছুই হয় না।'

'তাহলে কি মনে করে তুই এই কাজটা করলি? কি জানিস তুই এই মেয়ে সম্পর্কে?'

'বিশেষ কিছু জানি না।'

'মেয়ের বাবা — উনি করেন কি?'

'বলতে পারছি না। ব্যবসা-ট্যাবসা করেন বোধহয়।'

'উনার নাম কি?'

'নাম জানি না। কখনো জিজ্ঞেস করিনি। রূপাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলব।'

বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩

আমাদের বারান্দায় দু'টি ইজিচেয়ার ছিল। দু'টি ইজিচেয়ারের একটি আমি আমার ঘরে নিয়ে এসেছি। বিয়ের পর আমার শোবার ঘরের পরিবর্তনের মধ্যে এই পরিবর্তনটা হয়েছে। ও আচ্ছা, আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে—ইজিচেয়ারের পাশে বড় একটা টেবিল ল্যাম্প। এই টেবিল ল্যাম্প রূপাদের বাড়ি থেকে এসেছে। রূপার বাবা দেশে ফিরেই তাঁর কন্যার ব্যবহারী শাড়ি, গয়না, কিছু ফার্নিচার একটা পিক আপ ভর্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে আধ পৃষ্ঠার একটা চিঠি। ব্যক্তিগত চিঠি—তাঁর কন্যাকে লেখা। আমার পড়ার কথা না, পড়া উচিতও না। যেহেতু চিঠি দু' দিন ধরে আমার টেবিলে পড়ে আছে কাজেই আমি পড়েছি।

মা রূপা,

তোমার শাড়ি, গয়না, পাস বই, চেক বই পাঠালাম। ছোট স্যুটকেসটায় কসমেটিকস। তোমার ড্রেসিং টেবিলে যা পেয়েছি সবই দিয়ে দিয়েছি। কাজগুলি দ্রুত করতে হয়েছে, কারণ আমি আবার মাস তিনেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। বাড়ি তালাবন্ধ থাকবে। চাবি তোমার রহমান চাচার কাছে থাকবে। প্রয়োজনে তার কাছ থেকে নিতে পার। তবে তাকে পাওয়া এক সমস্যা। তোমার ব্যবহারী জিনিসপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, তার মানে এই নয় যে হুট করে তুমি যে কাণ্ডটি করেছ তা ক্ষমা করা হয়েছে। তোমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল, তার থেকে বাঁচার জন্য 'বিয়ে' নামক ব্যপারটি ব্যবহার করেছ। বিয়ে সমস্যা থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা নয়। তোমার মা'ও সমস্যা এড়াবার জন্যে আমাকে বিয়ে করে অনেক বড় সমস্যা তৈরি করেছিলেন। আমি দুঃখিত হয়ে লক্ষ করছি, তোমার মা যেসব ভুল তার জীবনে করেছিল, তুমিও একে একে তাই করতে যাচ্ছ। তোমার মা এক একটা ভুল করত, আর সেই ভুলকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার হাস্যকর চেষ্টা করত। তুমিও হয়তো তাই করবে। যে ছেলেটিকে তুমি ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলে সে কেমন ছেলে আমরা পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তুমিই ভাল বলতে পারবে। তার সঙ্গে দু'দিন আমার দেখা হয়েছে। সামান্য কথা হয়েছে। আমার কাছে তাকে নির্বোধ বলে মনে হয়েছে। কে জানে, হয়তো নির্বোধ ছেলেই তোমার কাম্য।

ভাল থাক, এই শুভ কামনা। সব বাবার মতো আমিও তোমার মঙ্গল কামনাই করছি। তোমার বাইশ বছরের জীবনে আমি তোমার প্রতি ভালবাসার কোনো অভাব দেখাইনি। আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হয়েছে জানার পর আমি তোমাকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমার মা'র মৃত্যুর পর আমি অনায়াসে আরেকটি বিয়ে করতে পারতাম। তা করিনি। তোমার অযত্ন হবে, অবহেলা হবে, এই ভেবেই করিনি। তুমি আমার সেই ভালবাসা তুচ্ছ করেছ। এই স্বভাবও তুমি পেয়েছ তোমার মা'র কাছ থেকে। তোমার মা বেঁচে থাকলে হয়ত সে বলত—রূপা, তুমি যা করেছ ভালই করেছ। আমি তা বলতে পারছি না । যাই হোক, শেষ কথাটি বলছি—আমার বাড়ির দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা থাকবে তোমার সব আশ্রয় নষ্ট হবার পর যদি ফিরতে ইচ্ছা করে ফিরতে পারবে।

তোমার বাবা।

প্রথমে ভেবেছিলাম, রূপা ইচ্ছা করেই এই চিঠি টেবিলে ফেলে রেখেছে যাতে আমি পড়তে পারি। সেই ধারণা ঠিক না। রূপার স্বভাবই হচ্ছে এলোমেলো অগোছালো। গোসলখানায় গোসল করতে গিয়ে সে গলার হার খুলে রেখে এসেছিল। মুনিয়া তাতে খুব হৈচৈ করছিল। রূপা অবাক হয়ে বলেছে — সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত হৈচৈ কেন? মুনিয়া বলল, ঘরে তিনটা কাজের লোক, যদি চুরি হত? রূপা বলল, চুরি হলে কি আর করা। এম্নিতেও তো অনেক সময় হারায়। হঠাৎ গলা থেকে খুলে পড়ে।

'দামী একটা হার হঠাৎ গলা থেকে খুলে পড়বে?'

'দামী হার গলা থেকে খুলে পড়তে পারবে না এমন কোনো আইন তো নেই মুনিয়া। মানুষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়, আর সামান্য গলার হার।'

মুনিয়ার ধারণা, এসব হচ্ছে রূপার চালবাজি কথা। আমি জানি চালবাজি কথা না। সে যা ভাবছে তাই বলছে। মন রেখে কথা বলার বিদ্যা এখনো বোধহয় শিখে উঠতে পারেনি।

আমি ইজিচেয়ারে বসে আছি। হাতে গতকালকের পত্রিকা। পত্রিকা রেখেছি পড়ার জন্যে না। মুখ আড়াল করে রাখার জন্যে। মুখ আড়াল করে আমি রূপার কথা শুনছি।

রূপা লাবণ্যের সঙ্গে লুডু খেলতে খেলতে কথা বলছে। ভাঙা ভাঙা কথা, যা একমাত্র ছোটদের সঙ্গেই বলা যায়।

'লাবণ্য সোনা, এই নাও চার চাললাম। ওয়ান টু থ্রী ফোর। তোমার দুই হয়েছে, তুমি দুই চালবে। উহু, তুমি উল্টোদিকে চলেছ। সব খেলার নিয়ম আছে। যে খেলার

যে নিয়ম সেই খেলা সেই ভাবে খেলতে হয়। উল্টো খেলা যায় না। আমি কি বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ লাবণ্য?'

'পারছি।'

'ভেরি গুড। ছোটরা খুব সহজে জটিল জিনিস বোঝে। বড়রা বুঝতে চায় না। বুঝিয়ে দিলেও ভাব করে যে বোঝেনি। ছোট থাকাই ভাল। তাই না ?'

'হ্যাঁ ।'

'তুমি কি ছোট থাকতে চাও?'

'চাই।'

'কিন্তু ছোট থাকার সমস্যাও আছে। ছোটরা নিজেদের পছন্দমতো জিনিস কখনো পায় না। তাদের চলতে হয় বড়দের পছন্দে। যেমন ধর, আমি এখন চা খাব। তুমি খাবে না।'

'আমিও পিরিচে ঢেলে চা খাব।'

'আচ্ছা, দেয়া হবে। যাও, চায়ের কথা বলে আস।'

লাবণ্য চায়ের কথা বলতে উঠে গেল। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা হল। ছাদে গিয়েছিলাম, সে রীতিমতো ধমক দিল—গাল ফুলিয়ে বলল, এখানে কি করছেন?

আমি বললাম, হাঁটছি।

সে বলল, সন্ধ্যাবেলা হাঁটছেন কেন?

আমি বললাম, সন্ধ্যাবেলা হাঁটা কি নিষিদ্ধ?

'ছাদে হাঁটা নিষেধ। আমার ডিসটার্ব হয়। পড়াশোনা করছি—এক মাসও নেই পরীক্ষার। ছাদে কেউ এলেই আমি ডিসটার্বড ফিল করি।

আমি বললাম, আমি ছাদে হাঁটতে এসেছি, আপনি পড়ছেন—এতে আমিও ডিসটার্বড ফিল করছি। ঠিকমতো হাঁটতে পারছি না। আপনি বরং এক কাজ করুন, বই নিয়ে নিচে চলে যান, আমার হাঁটা শেষ হলে আবার আসবেন।

'আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন কেন? আমি মুনিয়ারও ছোট।'

'ও আচ্ছা। বুড়োদের মত দেখাচ্ছে বলে আপনি বলছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি সবার বড়।'

'আমার গত ডিসেম্বরে ২৫ হয়েছে।'

'ডিসেম্বরের কত তারিখ?'

'২৩শে ডিসেম্বর।'

'ঠিক আছে, পড়াশোনা করতে থাক, আমি নিচে যাই।' এই বলে আমি নিচে

চলে এলাম। তোমরা ছিটগ্রস্ত পরিবার। তোমার ভাইয়েরও তোমার মতো ব্রেইন এলোমেলো।'

আমি বললাম, আমার ব্রেইন কি এলোমেলো?

'হ্যাঁ। এক ঘন্টা ধরে বাসি একটা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে আছ। সারাক্ষণ দেখি ইজিচেয়ারটায় বসে আছে। কি আছে এই চেয়ারটায়?'

'কিছু নেই।'

'তাহলে বসে থাক কেন?'

'বসে থাকতে ভাল লাগে, তাই বসে থাকি।'

'তোমার এই উত্তর আমার পছন্দ হয়েছে। যা করতে তোমার ভাল লাগে তা অবশ্যই করবে। কে কি বলছে বা বলছে, না তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কারণ একটা জিনিস মনে রাখবে—তুমি আছ বলেই এই পৃথিবী টিকে আছে। তুমি নেই পৃথিবীও নেই।'

'আমার কাছে নেই। অন্যের কাছে তো আছে।'

'অন্যের কাছে থাকলে তোমার কি? তোমার কিছু যাচ্ছে আসছে না। শোন, তোমার যা ভাল লাগে তুমি করবে। আমি কখনো বাধা দেব না। ঠিক একইভাবে আমি আশা করব আমি যা করব তা আমাকে করতে দেবে। বাধা দেবে না। এই একটা ব্যাপার ঠিক করে নিলে আমাদের কখনো কোনো সমস্যা হবে না।'

'এইসব কথা তুমি কি তোমার মা'র কাছে শিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি সব সময় তোমাকে উপদেশ দিতেন?'

'মোটেও উপদেশ দিতেন না। তিনি তাঁর সব উপদেশ একদিন দিলেন। তাঁর উপদেশ দেয়ার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ। শুনতে চাও?'

'চাই।'

'আমার তখন বয়স বার। ঘুমুচ্ছি। রাত দু'টার মতো বাজে। মা এসে আমাকে ডেকে তুললেন। আমি বললাম, কি ব্যাপার? মা বললেন — কফি খাবার জন্য ডাকলাম। আমি বললাম, রাত-দুপুরে কফি খাব কেন? মা বললেন, রাত-দুপুরে কফি খাওয়া যাবে না, এমন তো কোনো কথা নেই লিটল ডার্লিং।

আমি মা'র সঙ্গে কফি খেলাম। দু'জন খানিকক্ষণ বারান্দায় হাঁটলাম। মা আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন । ঘণ্টাখানিক উপদেশ দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন মা'র স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল। কোনো পরিশ্রম করতে পারেন না। সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না। তাঁকে ধরে ধরে দোতলায় তুলতে হয়।

পরদিন ভোরবেলা শুনলাম ঘুমের মধ্যে মা মারা গেছেন। হার্ট ছিল দুর্বল, অতিরিক্ত ঘুমের অষুধ খেয়েছিলেন। শরীর সহ্য করতে পারেনি।

যদিও আমার ধারণা এটা আত্মহত্যা, নয়তো আমাকে রাত দু'টায় ঘুম থেকে তুলে উপদেশ দিতেন না। তোমার কি মনে হয় আমার অনুমান ঠিক আছে? খবরের কাগজ হাতে আমি রূপার দিকে তাকিয়ে আছি। কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া সে এই গল্প কি করে করল! লাবণ্যও পাশে বসে হাঁ করে কথা শুনছে।

আমি কিছু বলার আগেই মুনিয়া চা নিয়ে ঢুকল এবং গম্ভীর গলায় বলল, ভাবী, লাবণ্যকে তুমি কিন্তু চা দেবে না। ও আজেবাজে সব অভ্যেস করছে। আর শোন দাদা তুই একটু নিচে যা।

আমি বললাম, কেন?

'সফিক ভাই এসেছে। তোকে চাচ্ছে।'

'বলে দে বাসায় নেই।'

'একটু আগে বলেছি, তুই বাসায় আছিস।'

'এখন বলে দে—আমি বাসায় নেই।'

'মিথ্যা আমি বলতে পারব না দাদ তুই নিজে গিয়ে বলে আয় যে তুই বাসায় নেই।'

মুনিয়া শুকনো মুখে চলে গেল। রূপা বলল, আমি বলে আসি। উনি আসলে আমাকে দেখতেই এসেছেন। প্রতি দশ থেকে বারো দিন পরপর উনি আমাকে দেখতে আসেন। এই চক্রটা আমি হিসেব করে বের করেছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে এগারো দিন আগে।

রূপা নিচে নেমে গেল। আমি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে রইলাম। লাবণ্য বলল, মামা লুডু খেলবে?

আমি বললাম, না।

'একটু খেল মামা। তুমি কালো আমি লাল।'

'না।'

'খেল মামা, খেল। খেলতেই হবে।'

আমি ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বেশ জোরেই তার গালে একটা চড় বসালাম। মেয়েটা মুহূর্তে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। মুনিয়া ছুটে এসে বলল, কি হয়েছে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তেমন কিছু হয়নি। চড় মেরেছি। বড্ড বিরক্ত করছিল।

মুনিয়া হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, এইভাবে তাকিয়ে থাকিস না মুনিয়া। তোকে কালো টিকটিকির মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তোর চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসবে।

'ঠিক করে আমাকে বল তো দাদা, কেন মারলি?'

'আমাকে লুডু খেলতে বলছিল। খেলব না বলছি, তারপরেও জোর করছে। চড় মারার ফলে ভবিষ্যতে আর কখনো জোর খাটাতে আসবে না। একই সঙ্গে বুঝতে পারবে পৃথিবী জোর খাটানোর জায়গা নয়।'

'তোর মাথা খারাপ। তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

আমি আবার খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরলাম। মুনিয়া হিসহিস করতে করতে বলল, আমাকে কালো টিকটিকি কেন বললে, গায়ের রঙ কালো বলে?

'হুঁ।'

'ফর্সা রঙ দেখে মাথা আউলা হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীকে এখন কালো লাগছে।'

'সারা পৃথিবীকে লাগছে না, তোকে লাগছে।'

মুনিয়া দরজা ধরে কাঁদতে লাগল। আমি যা করেছি তা ঘোরতর অন্যায়। আমার কথায় মুনিয়া যে কাঁদছে, তাতে তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে কেউই কাঁদবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার সামান্য হলেও অনুশোচনা এবং গ্লানি বোধ করা উচিত — তা করছি না। বরং ইচ্ছা করছে এ বাড়ির প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীকে কাঁদিয়ে দিতে।

মাকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ ঝগড়া করলে কেমন হয়। না, ঝগড়া না, এই জিনিস আমি পারি না। মা'কে কিছু কঠিন কথা শুনিয়ে আসা যায়। কিংবা দোতলায় উঠে বাবুকে বলে আসা যায় — বাবু শোন, তুই আসলে মহামূর্খ। কিছু জটিল ইকোয়েশন মুখস্থ করার বিদ্যা ছাড়া পরম করুণাময় ঈশ্বর তোকে আর কিছু দেননি। তোকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে ফিজিক্সের একটা শুকনো বই বানিয়ে।

আমি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলাম। যার সঙ্গেই প্রথম দেখা হবে, তাঁকে কিছু কথা বার্তা বলব। বাবার সঙ্গে দেখা হলে বাবাকে।

দেখা হল মা'র সঙ্গে। এই মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। মতির মা চিরুনি দিয়ে তাঁর মাথার উকুন এনে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে কাজটিতে দু'জনই খুব আনন্দ পাচ্ছে। প্রাণীহত্যা আনন্দজনক কাজ তো বটেই। প্রাণী যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাকে হত্যায় আনন্দ আছে। উকুন এবং মশা প্রাণী হিসেবে কাছাকাছি — দু'জনই রক্ত

খায়। তারপরেও উকুন মারার আনন্দ বেশি, কারণ এরা শব্দ করে মারা যায়। নখ দিয়ে এদের ফুটানো হয়।

মা বললেন, রঞ্জু, বৌমা কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সফিকের সঙ্গে।

'যার তার সঙ্গে তার এত কি কথা?'

আমি আবার হাই তুললাম, কোন লাইনে মা'কে আক্রমন করা যায় ঠিক বুঝতে পারছি না। মা'র ধারণা, মানুষ হিসেবে তিনি প্রথম শ্রেণীর। দয়ামায়ায় তাঁর অন্তর পূর্ণ। নামাজ রোজা করছেন । প্রয়োজনের বেশি করছেন। শুক্রবারে ফকির এলে ভিক্ষা না নিয়ে বিদেয় হয় না। মা'র নির্দেশ, শুক্রবারে ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে একবার গাড়ি করে পল্লবীর দিকে যাচ্ছি। সোনারগাঁ হোটেলের কাছে লাল লাইটে গাড়ি থামল। দু'টা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল ফুল বিক্রি করতে। আমি গলার স্বর যথাসম্ভব কর্কশ করে বললাম, ভাগো।

মা অবাক হয়ে বললেন, ভাগো ভাগো বলছিস কেন? গরিব মানুষ না? শীতের সময় খালিগায়ে ফুল বিক্রি করছে—'আহা রে!' তিনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দু'জনকে দু'টা টাকা দিলেন। গরিবের দুঃখে কাতর এই মা'র অন্য একটি ছবিও আছে, সেই ছবিও সবার চেনা, কিন্তু সেই ছবি কারো চোখে পড়ে না। জাহেদা নামে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। কোলের একটা বাচ্চা নিয়ে সে কাজ করতে এসেছিল। বাচ্চাটা বেশির ভাগ সময় কাঁদত। খিদের যন্ত্রণাতেই কাঁদত। জাহেদা মাঝে মাঝে চুরি করে দুধ নিয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াত। একদিন ধরা পড়ে গেল। মা রেগে আগুন। বিদায় হও। এক্ষুণি বিদায় হও। ঘরে চোর পুষছি। কি সর্বনাশের কথা! জাহেদা মা'র পা জড়িয়ে ধরল। দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু নিয়ে মানুষের বাড়িতে কাজ পাওয়া তার সহজ হবে না।

মা'র মন গলল না। তাঁর এক কথা — বাড়িতে আমি চোর রাখব না। আমাদের পরম করুণাময়ী মাতা চোর বিদায় করে দিলেন।

চোর বিদায়ের কথা তুলব, না অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলব বুঝতে পারছি না। চোর বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলা ঠিক হবে না, কারণ এতদিন আগের কথা মা'র মনে নেই। তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। নামতা পর্য্যন্ত মনে থাকে না। ঐ দিন কি একটা জিনিসের দাম ঠিক করতে গিয়ে নামতা গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমাকে বললেন, সাত আট কত রে রঞ্জু? আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম বাহান্ন। মা বাহান্ন স্বীকার করেই চলে গেলেন। কাজেই চুরির প্রসঙ্গ থাক। অন্য কোনো প্রসঙ্গে আক্রমণ শুরু করা যাক।

মা বললেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঐ মোড়াটায় বোস না।

আমি বসলাম। মা বললেন, তোর বাবা ঐ দিন বলছিলেন, রঞ্জুর যা স্বভাব, ও কোনো চাকরি-বাকরি করবে বলে তো মনে হয় না। ওকে একটা ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়। কি রে, করবি ব্যবসা? বিয়েটিয়ে করেছিস, এখন রোজগারের কথা চিন্তা করবি না? তোর শ্বশুর তো বিরাট পয়সাওয়ালা লোক, ওঁকে বল তোকে কোন একটা ব্যবসা শুরু করিয়ে দিতে।

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, শিগগিরই বলব।

কোনো একটা ব্যবসা-টেবসা শুরু করলে মন ভাল থাকবে। দিন-রাত ইজিচেয়ার শুয়ে থাকা তো কাজের কথা না।

'তা তো ঠিকই।'

'তোর বাবা বলছিলেন—বিনা কারণে একটা মানুষ দিন-রাত শুয়ে থাকে কি ভাবে?'

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, বিনা কারণে শুয়ে থাকিনা তো। শুয়ে শুয়ে ভাবি।

'কি ভাবিস?'

'একটা খুন করার কথা ভাবছি।'

'কি বলছিস তুই!'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সত্যি কথা বলছি মা।

'কাকে খুণ করবি?'

'সেটা এখনো ফাইনাল করিনি।'

৪

রূপাদের বাড়ি থেকে একটা মাছ এসেছে। তার আকৃতি হুলস্থূল ধরনের। মাছ বললে এই জলজ প্রাণীটির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হয় না। মৎস্য বললে কিছুটা হয়। সেই 'মৎস্য' দু'জন ধরাধরি করে বারান্দায় এনে রাখল। আমাদের বাসার সবারই হতভম্ব হয়ে যাওয়া উচিত ছিল—কেউ হতভম্ব হলাম না। বরং সবাই এমন ভাব করতে লাগলাম, যেন খুব বিরক্ত হয়েছি। আমাদের বাসার অলিখিত নিয়ম হচ্ছে — রূপাদের প্রতিটি কার্যকলাপে আমরা বিরক্ত হবো। রূপাদের কোনো আত্মীয় টেলিফোন করলে আমরা শুকনো গলায় বলব, এখন কথা বলতে পারছি না, খুব ব্যস্ত, পরে করুন। এরপর আর টেলিফোন করা উচিত নয়। তবু যদি লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ করে, তখন বলা হয়, বাসায় নেই। কখন ফিরবে বলা যাচ্ছে না।

রূপার চাচা কিছুদিন আগে এসেছিলেন। তাঁকে বসার ঘরে একা একা ঘণ্টখানিক বসিয়ে রাখা হল। আমাদের কাজের ছেলের হাতে চা পাঠিয়ে দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত বাবা অবশ্যি দেখা করতে গেলেন। কয়েকবার হাই তুলে বললেন, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। প্রেসার বেড়েছে । আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আরেকদিন আসুন। চা-টা খেয়েছেন তো?

প্রকাণ্ড পাংগাশ মাছ বারান্দায় পড়ে আছে। সবাই বিরক্ত মুখে দেখছে। শুধু আমাদের বেড়ালটা মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। বেড়ালটাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি যে ও-বাড়ির কোনো কিছুতেই এত আনন্দিত হতে নেই । আমার মা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এই মাছ এখন কে কাটবে?

যে লোক মাছের সঙ্গে এসেছে, সে হাসিমুখে বলল, আম্মা, মাছ কাটার লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বটিও এনেছি। আগে সবাই দেখুন, তারপরে কাটার ব্যবস্থা হবে।

'মাছ কাটার লোক কোথায়?'

'গাড়িতে বসে আছে আম্মা, সবাইকে ডাকুন, সবাই দেখুক।'

মা বললেন, এত দেখাদেখির কি আছে? বড় মাছ কি আমরা আগে দেখিনি?'

লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, অবশ্যই দেখেছেন আম্মা, অবশ্যই দেখেছেন। এই মাছটার ওজন হল এক মণ। এক সের কম এক মণ। উনচল্লিশ সের। আপাকে ডাকেন। আপা দেখুক, স্যার বলে দিয়েছেন। আপাকে না দেখিয়ে মাছ যেন কাটা না হয়।

রূপাকে ডাকা হল। সে মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্, কি অদ্ভুত সুন্দর! রূপার পাতের মতো ঝিকমিক করছে।

আমি দোতলায় উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, মানুষের সৌন্দর্যবোধের নানা দিক আছে। মাছের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে কেটেকুটে আমরা খেয়ে ফেলছি। এর কোনো মানে হয়!

রাতে খেতে বসে রূপা বলল 'এ কি, বড় মাছটা রান্না হয়নি?'

মুনিয়া বলল, 'না।'

'না কেন?'

'ডীপ ফ্রীজে রেখে দেয়া হয়েছে। পরে রান্না হবে। আমাদের নিজেদের বাজার রান্না করা হয়েছে।'

রূপা আর কিছু বলল না, কিন্তু তার মুখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটা দূর হল না। বড় মাছটা রান্না হয়নি, এটা সে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আমি বললাম, পাংগাশ মাছ কি তোমার খুব প্রিয়?

রূপা বলল, পাংগাশ মাছ প্রিয় হবে কেন? কোনো মাছই আমার প্রিয় না। ইলিশ মাছের ডিম খানিকটা প্রিয়।

'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে—মাছটা রান্না না হওয়ায় আপসেট হয়ে পড়েছ।'

'আপসেট হবার কারণ আছে বলেই আপসেট হচ্ছি। তুমি যদি শোন, তুমিও আপসেট হবে। এই জন্যেই তোমাকে শোনাব না। কেন আপসেট হচ্ছি, পরশু বলব।'

'এখনি বলো।'

'না।'

রূপা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। তার মন-খারাপ ভাব স্থায়ী হল না। ঘরে ঢুকেই গান চালিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাজগোজ করলে কেমন হয়? আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, রাত এগারোটায়!

'হুঁ। রাত এগারোটায় সাজা যাবে না, এমন তো কোনো আইন নেই। আর এ রকম আইন থাকলেও আমি মানতাম না। আচ্ছা শোন, তুমি কি মানবেন্দ্রের ঐ গানটা শুনেছ, ওগো সুন্দরী আজ অপরূপ সাজে, সাজো সাজো সাজো. . . '

'না।'

'আমি যখন ছোট ছিলাম অর্থাৎ কলেজে যখন পড়তাম, তখন এই গানটা বাজাতে বাজাতে সাজতাম। আমার তখন মনে হতো কি জানো? মনে হতো আমার জন্যেই যেন গানটা লেখা হয়েছে। অবশ্যি এই ব্যাপারটা এখনো আমার মধ্যে আছে,

কোনো কোনো গান শুনলেই মনে হয় এই গান আমার জন্যে লেখা, অন্য কারো জন্যে নয়। তোমার কি এরকম মনে হয়?'

'না।'

'তুমি ক্যামেরাটা নিয়ে এসো তো, আমার সাজগোজ শেষ হলে একটা ছবি তুলবে।'

ক্যামেরায় ফিল্ম ছিল না বলে ছবি তোলা গেল না। রূপা করুণ গলায় বলল, 'দোকানপাট নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে, এত রাতে কি আর ফিল্ম পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া না যাবারই কথা।'

'এসো তাহলে শুয়ে পড়ি, কি আর করা।'

আমরা ঘুমুতে গেলাম বারোটার দিকে। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করামাত্র রূপা বলল, মাছের ব্যাপারে কেন আপসেট হয়েছিলাম তোমাকে বলেই ফেলি।

'তোমার বলতে ইচ্ছা না হলে বলার দরকার নেই।'

'ইচ্ছা হচ্ছে। আজ থেকে বাইশ বছর আগে বাবা বিশাল একটা পাংগাশ মাছ এনেছিলেন। মাছ নিয়ে ঘরে ঢোকামাত্র বাবা আমার জন্মসংবাদ পেলেন। মাছটা রূপার মতো চকচক করছিল। মাছের রূপালি রঙ থেকে রূপা নাম নিয়ে বাবা আমার নাম রাখলেন। সেই থেকে অলিখিত নিয়মের মতো হয়ে গেল, আমার জন্মদিনে বাজারের সবচে' বড় মাছটা আসবে। গতবার এসেছিল চিতল মাছ। লম্বায় প্রায় আমার সমান।'

'আজ কি তোমার জন্মদিন?'

'ইয়েস স্যার। তুমি ইচ্ছে করলে শুভ জন্মদিন বলতে পার।'

'শুভ জন্মদিন রূপা।'

'থ্যাংক ইউ।'

'তোমার জন্ম কি দেশে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। মিটফোর্ড হাসপাতালে।'

'আমার ধারণা, তোমার জন্ম বিদেশে।'

'যতই দিন যাবে, দেখবে, আমার সম্পর্কে তোমার বেশির ভাগ ধারণাই ভুল।'

'আজ যে তোমার জন্মদিন আগে বললে না কেন?'

'আগে বলব কি করে? আমার নিজেরই মনে ছিল নাকি? মাছ দেখে মনে পড়ল।'

রূপা তরল গলায় হাসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার মন আসলেই খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছি আজ রাতে আর ঘুম হবে না।

এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে হবে। জন্মদিনের খবরটা কাল ভোরে দিলেও অনিদ্রার হাত থেকে বাঁচতাম।

রূপার বাবা ভদ্রলোককে যতটা খারাপ শুরুতে ভাবছিলাম এখন মনে হচ্ছে ভদ্রলোক হয়তো ততটা খারাপ নন। জন্মদিন মনে রাখছেন, বিশাল মাছ পাঠাচ্ছেন। তবে আমার ধারণা, ভদ্রলোকের সীমা ঐ মাছ পর্যন্তই। কন্যার প্রতি ভালবাসার আর কোনো কোনো লক্ষণ এখনো তিনি দেখাননি। বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটে দেশের বাইরে। কিছু দিনের জন্যে দেশে আসেন। টেলিফোন করেন। মেয়ের সঙ্গে খুবই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা হয়। এই পর্যন্তই।

আমাদের বাড়িতে রূপাকে কেউ পছন্দ করে না। শুধু লাবণ্য পছন্দ করে। রূপার মতো লাবণ্যেরও ঘুম-রোগ আছে। ঘুম পেলেই সে রূপার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বে।

আমাদের বাড়িতে রূপাকে সবচে বেশি অপছন্দ করে মতির মা। সে সবসময়ই গলা নিচু করে মা'কে কিংবা মুনিয়াকে রূপা সম্পর্কে গুজগুজ করে কি সব যেন বলে। একদিন আমি খানিকটা শুনলাম—'আম্মা, গরীব মানুষ, আপনেরে একটা কথা কই—কিছু মনে নিয়েন না। দোষ হইলে ক্ষ্যামা দিয়েন। কথাটা হইল নয়া বৌরে নিয়া।'

মা গম্ভীর গলায় বললেন, কি কথা?

'নয়া বৌ-এর সাথে জ্বীন থাকে আম্মা। দুনিয়ায় যারা খুব সুন্দর মাইয়া তারার সাথে দুইটা তিনটা কইরা পুরুষ জ্বীন থাকে।'

'চুপ কর তো।'

'জানি আম্মা, আমার কথা শুনলে রাগ হইবেন। কিন্তু কথা সত্য। জ্বীনের সব লক্ষণ নয়া বৌ-এর আছে—এই যে রাইত দিন ঘুমায়, এর কারণ কি? কারণ একটাই। কইন্যা ঘুমের মইধ্যে থাকলে জ্বীন ভূতের জন্যে খুব সুবিধা।

এই জাতীয় কথা দাঁড়িয়ে শোনা অসম্ভব। আমি বাকিটা শুনিনি। তবে মা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিছুটা বিশ্বাসও করেছেন। মানুষ সত্যের চেয়ে অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। মুনিয়ার কথাই ধরা যাক, সে একটি চমৎকার মেয়ে। তার স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। লোকজনকে বলেছে স্ত্রীর চরিত্রহানি ঘটেছিল, সম্পর্ক ছিল অন্য একজনের সঙ্গে। লোকজন এই অসত্যটাই বিশ্বাস করেছে। শুধু লোকজন কেন, আমাদের নিকট-আত্মীয়স্বজনদেরও সে-রকম ধারণা। অসত্য বৃক্ষের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। অসত্য বৃক্ষকে সে কারণেই সহজে উপড়ে ফেলা যায় না।

৫

রূপা বলল, তুমি কি আমাকে সেগুনবাগিচায় নামিয়ে দিতে পারবে? কিছু জিজ্ঞেস করার সময় রূপা কখনো চোখের দিকে তাকায় না। প্রশ্নটা করছে আমাকে, অথচ সে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। শুরুতে খুব বিরক্তি লাগত। এখন লাগে না। বরং মনে হয় এটাই স্বাভাবিক।

আমি রূপার প্রশ্নের জবাব দিইনি। গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা করছি।

'কথা বলছ না কেন, আমাকে সেগুনবাগিচায় নামিয়ে দিতে পারবে?'

'পারব।'

'তাহলে চট করে প্যান্ট পরে নাও। লুঙ্গি পরে নিশ্চয়ই যাবে না। শেভ করো। দুদিন ধরে শেভও করছ না।'

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে আঁৎকে উঠলাম। দু'দিন শেভ না করায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। থুতনির কাছে চার পাঁচটা দাড়ি আবার শাদা। শাদা দাড়িগুলোর কল্যাণে চেহারায় প্রবীণ ভাব চলে এসেছে। শেভ করা মানে প্রবীণ ভাব বিসর্জন দেয়া, এটা কি ঠিক হবে? চেহারায় বুড়োটে ভাব আমার ভালই লাগে। বুড়ো লোকগুলো যখন চুলে কলপ দিয়ে, রঙচঙা শার্ট পরে তরুণ সাজতে চায় তখন অসহ্য লাগে। ইচ্ছা করে হাসতে হাসতে বলি, পঞ্চাশ ক্রশ করেছেন না? মৃত্যুর কিন্তু দেরি নেই, খুব বেশি হলে আর মাত্র দশ বছর। রঙচঙা জামা পরছেন, ভালো করছেন। শখ মিটিয়ে নেয়াই ভাল।

বাথরুম থেকে বের হয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে একতলায় এসে শুনলাম, রূপা রিকশা নিয়ে চলে গেছে। সে যে একা যাচ্ছে, আমাকে সঙ্গে নেবার দরকার নেই, তা-ও বলে যায়নি। আমি দিব্যি সেজেগুজে নেমে এসেছি।

এরকম অবস্থায় নিজেকে খানিকটা বোকা-বোকা লাগে। আমাকেও নিশ্চয়ই লাগছে। আমি বোকা ভাবটা চেহারা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সিগারেট ধরালাম। সিগারেট নিয়ে মুখের ভাবভঙ্গি অনেকখানি বদলে ফেলা যায়। মেয়েরা এই খবরটা জানে না। জানলে পুরুষের তিনগুণ সিগারেট খেত।

সিগারেটে সবে তিনটা টান দিয়েছি, মুনিয়া এসে বলল, তোকে বাবা ডাকছেন।

এক্ষুণি যেতে বললেন। এক্ষুণি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ফেলে দিলাম। এগিয়ে যাচ্ছি বাবার ঘরের দিকে, মুনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তোর তো খুবই বিশ্রী স্বভাব, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ফেলে চলে যাচ্ছিস! নিভিয়ে যাবি না? ঐদিন লাবণ্য পা পুড়ে ফেলেছে।

'খালি পায় হাঁটাহাঁটি করে কেন? ওকে না করতে পারিস না খালি পায়ে যেন হাঁটাহাঁটি না করে।'

এই বলে আমি বাবার ঘরে ঢুকে গেলাম।

বাবা অবেলায় বিছানায় শুয়ে আছেন। বুকে ব্যথা সম্ভবত শুরু হয়েছে। চোখ-মুখ দেখে কিছু অবশ্যি বোঝা যাচ্ছে না। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।

'বাবা ডেকেছ?'

'হুঁ, বৌমা কোথায় গেল?'

ঠিক প্রত্যাশিত প্রশ্ন নয়। রূপা কোথায় গেছে তা নিয়ে বাবাকে উদ্বিগ্ন হওয়া মানায় না। মুনিয়া যদি বলত, ভাবী কোথায়? সেটা মানিয়ে যেত কিংবা মা যদি বলতেন, অসময়ে বৌমা কোথায় গেল তাও মানাত—কিন্তু বাবা জিজ্ঞেস করবেন কেন?

আমি বললাম, সেগুনবাগিচার দিকে গেছে।

'ঐখানে কি?'

'জানি না।'

'জিজ্ঞেস করিসনি ?'

'না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যা।'

বাবার ঘর থেকে বের হয়ে এসে মনে হল সামান্য ভুল করা হয়েছে। আমার বলা উচিত ছিল, কি জন্যে জানতে চাচ্ছ? রূপাকে নিয়ে তুমি কি চিন্তিত ? রূপা এমন কিছু কি করেছে যার জন্যে চিন্তিত বোধ করছ?

সমস্যা হচ্ছে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোনো কথাই হয় না। সেই কথাবার্তাও সাধারণত খুব সংক্ষিপ্ত ধরনের। রূপা অবশ্যি হড়বড় করে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে। জেদী গলায় তর্ক করে। রূপার তর্ক করার ভঙ্গিটি খুব মজার, কিন্তু শুরুটা সে করে ভয়ঙ্করভাবে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় প্রতিপক্ষকে সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলবে। প্রতিপক্ষ যখন পুরোপুরি ঘায়েল, তখন সে হঠাৎ গা এলিয়ে বলবে — অবশ্যি আপনার কথা ঠিক। প্রতিপক্ষ

তখন হতচকিত। পুরোপুরি আনন্দিতও হতে পারছে না, কারণ সে জানে তর্কে জিততে পারেনি, আবার দুঃখিতও হতে পারছে না।

আমি চায়ের খোঁজে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি, বারান্দায় মা'র সঙ্গে দেখা। মা বললেন, বৌমা কোথায় গেছে রে? আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তোমার বৌমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

'সে তো বলল সেগুনবাগিচায় গেছে।'

'তাহলে সেখানেই গেছে। আচ্ছা মা, ব্যাপারটা কি শুনি তো?'

মা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, বউমা নাকি সিনেমা করছে। নায়িকার বোনের কি একটা চরিত্র।

'বলল কে তোমাকে?'

'পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে। তুই জানিস না কিছু?'

'জানি। তোমরা যা ভাবছ তা না। বিয়ের আগে ওরা কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে শর্ট ফিল্ম বানানো শুরু করেছিল। কাজ বন্ধ ছিল, এখন আবার শুরু হবার কথা।'

'বিয়ের পর আবার সিনেমা কি? বিয়ের আগে যা করেছে, করেছে।'

'বিয়ে করে তো পাপ করেনি যে সব ছেড়ে দিতে হবে?'

'পাপ–পুণ্যের কোনো ব্যাপার না। তুই তোর বৌকে দিয়ে অভিনয় করাতে চাস, করাবি। এটা তোর ব্যাপার। পত্রিকায় যেসব লেখা ছাপা হয় — পড়তে ভালো লাগে না। আত্মীয়স্বজনরা পড়ে। তারা মজা পায়। হাসাহাসি করে।

'কি লেখা হয়েছে?'

মা গম্ভীর গলায় বলল, মুনিয়ার কাছে কাগজটা আছে, পড়ে দেখ।

আমি মুনিয়ার কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে পাতা খুলে রীতিমত চমৎকৃত—পুরো পাতা ভর্তি রূপার ছবি। লেখার শিরোনাম হচ্ছে—তিনি নগ্ন হতে রাজি।

বেশ দীর্ঘ প্রতিবেদন, পুরো তিন কলাম ছাপা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক জানাচ্ছেন শর্ট ফিল্ম 'সজনে ফুল'-এর নির্মাণ–কাজ শেষ পর্যায়ে। ছবির তরুণ পরিচালক মুহাম্মদ জোবায়েদ এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে সামান্য কিছু প্যাচওয়ার্ক ছাড়া ছবির সব কাজ শেষ হয়েছে। জুন মাস নাগাদ ছবিটি সেন্সর বোর্ডের নিকট পাঠানো হবে। ছবিতে একটি খোলামেলা দৃশ্য আছে যে কারণে সেন্সর বোর্ড ছবিটির ব্যাপারে আপত্তি তুলতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, জাতীয় সেন্সর বোর্ডে কিছু তথাকথিত নীতিবাগীশ লোক আছেন যাঁরা পান থেকে চুন খসলেই "গেল, গেল" বলে হৈচৈ শুরু করেন। সহজ বাস্তবতাকে

স্বীকার করে নেবার মানসিকতা তাঁদের নেই। আমাদের ছবিতে কিছু খোলামেলা দৃশ্য আছে, যা গল্পের প্রয়োজনে এসেছে এবং খুব শিল্পসম্মতভাবেই এসেছে। কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষই এই দৃশ্য নিয়ে আপত্তি তুলবেন না। মুহাম্মদ জোবায়েদ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বর্তমান সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে 'মুক্তবুদ্ধি'র ব্যাপারটা একেবারেই নেই। তাঁদের সবার দৃষ্টি একচক্ষু হরিণের মতো।

'সজনে ফুল' ছবির খোলামেলা দৃশ্য নিয়ে অভিনেত্রী রূপা চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে রূপা চৌধুরী বলেন, নগ্ন হওয়াটাকে তিনি কিছু মনে করেন না। তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে নগ্ন করেই পাঠিয়েছিলেন, এই সত্যটি মনে রাখলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" এই প্রতিবেদক ঠাট্টাচ্ছলে রূপা চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি নগ্ন হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন? রূপা চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, আমি পারব তবে সেই দৃশ্য আপনারা সহ্য করতে পারবেন না।

পত্রিকায় রূপার যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি ভদ্র ছবি। তবে প্রতিবেদন পড়বার পর ছবিটির দিকে তাকালেই পাঠকদের চোখে একটি নগ্ন মেয়ের ছবিই ভেসে উঠবে। আমি পত্রিকা হাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলাম। এ কি সমস্যা! বাবু এসে বলল, দাদা, ভাবী নাকি সিনেমা করছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'ছবিটা দেখতে চাচ্ছি। পরীক্ষার পর রিলিজ হবে তো?'

'জানি না।'

'কাহিনীটা কি তুমি জান?'

'না।'

রূপা এল সন্ধ্যার পর।

কুচকুচে কালো রঙের একটা টয়োটা গাড়ি রূপাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। রূপা দোতলায় উঠে এল লাবণ্যকে কোলে নিয়ে। বাইরে থেকে এলেই রূপা কিছুটা সময় লাবণ্যর সঙ্গে কাটাবে।

রূপা লাবণ্যকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। লাবণ্যর সঙ্গে কথাবার্তা এবং হুটোপুটি হতে থাকল। আমি যে পাশেই আছি, তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছি, এ নিয়ে রূপার কোনো মাথাব্যথা নেই ...

'ও লাবণ্য সোনা, ভুনভুনা, খুনখুনা, ঝুনঝুনা!'

'কি?'

'আপনি কি করছেন?'

'আমি কিছু করছি না।'

'কে আপনাকে আদর করছে?'

'তুমি।'

'তুমিটা কে?'

'তুমি হচ্ছ রূপা।'

'রূপাকে তুমি কি ডাক?'

'মামী ডাকি।'

'তোমার মামী কি সুন্দর?'

'হ্যাঁ।'

'অল্প সুন্দর না খুব বেশি সুন্দর?'

'খুব বেশি সুন্দর।'

'কিসের মতো সুন্দর?'

'চাঁদের মতো।'

'চাঁদের কবিতাটা বলেন তো লাবণ্য সোনা।'

'বলব না।'

'বলতে হবে।'

'না, বলব না।'

'বলতেই হবে, বলতেই হবে, বলতেই হবে।'

'বলব না, বলব না।'

'তাহলে একটু হাসেন।'

'হাসব না।'

'তাহলে একটু কাঁদেন প্লীজ, প্লীজ। প্লীজ লাবণ্য।'

'কাঁদব না।'

'তাহলে একটু নিচে গিয়ে বলুন তো আমাকে এক কাপ চা দিতে।'

লাবণ্য নিচে চলে গেল। আমার মনে হল আদরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খবর কি?

আমি বললাম, কোনো খবর নেই।

'সারাদিন ঘরেই ছিলে, না কোথাও গিয়েছিলে?'

'ঘরেই ছিলাম। আচ্ছা রূপা শোন, তুমি আমাকে বললে সেগুনবাগিচায় নামিয়ে দিতে, তারপর আমাকে না নিয়েই চলে গেলে!'

'শেষ মুহূর্তে তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করল না।'

রূপা বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুম থেকেই বলল, সারাদিন ঘরে বসে আছ এটা তো ভাল কথা না। বাইরে থেকে ঘুরে-টুরে এসো।

'কোথায় যাব?'

'কোনো বন্ধুর বাড়ি যাও। তাস-টাস খেলে এসো। সারাক্ষণ ঘরে থাকলে কি হয় জান? সবার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ঝগড়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছ।'

অনেকদিন কারোর বাসায় যাওয়া হয় না। যেতে ইচ্ছা করে না। বন্ধুবান্ধব কারোর সঙ্গে দেখা হলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। রিকশায় হুড উঠিয়ে চলাফেরা করি। সেদিন মজিদ বাসায় এসেছিল। আমি বলে পাঠালাম, বাসায় নেই। অথচ মজিদের সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই। সে মজার কথা বলে খুব হাসাতে পারে। এরকম হচ্ছে কেন আমি জানি না। বিয়ের পর মানুষ খানিকটা বদলায়, এতটা কি বদলায়? মুনিয়ার ধারণা, কাফকা'র গল্পের নায়কের মতো আমার মেটামরফসিস হচ্ছে—আমি ধীরে ধীরে মানুষ থেকে ফার্নিচার হয়ে যাচ্ছি। আমি বললাম, কি ফার্নিচার হচ্ছি বলে তোর ধারণা? সে বলল, তুমি খুব ধীরে ধীরে একটা ইজিচেয়ার হয়ে যাচ্ছ।

সত্যি বোধহয় তাই হচ্ছি। ছিলাম মানুষ, হয়ে যাচ্ছি ইজিচেয়ার।

আমি রূপাকে ঘরে রেখে অনেকদিন পর বাড়ি থেকে বের হলাম। কোথায় যাব ঠিক করা নেই। রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটব। মোড়ের সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। দোকানদার আমার চেনা। সে হাসিমুখে বলল, ভাইজানরে তো আইজকাইল দেখি না।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ব্যাটা কি কথার কথা বলছে না সত্যি সত্যিই লক্ষ করছে যে, আমি আজকাল ঘর থেকে কম বেরুচ্ছি।

'ভাইজানের শইল ভালো তো? আপনেরে কেমুন জানি কাহিল লাগতাছে।'

আমি এই কথারও জবাব দিলাম না। তার এই কথাটা সম্ভবত সত্যি, আমাকে কাহিল যে দেখাচ্ছে তা নিজেই বুঝতে পারছি। কারণ রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না। প্রায় জেগে জেগেই রাত পার করছি। আমার পাশে শুয়ে রূপা এক ঘুমে রাত পার করে দিচ্ছে। অনিদ্রার রুগীরা সাধারণত দিনে ঘুমিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। আমার সেই অবস্থাও নেই। দিনে আমি কখনো ঘুমতে পারি না।

সিগারেটের দোকানের সামনে থেকেই আমি রিকশা নিয়ে নিলাম। সেই রিকশা

নিয়ে চলে গেলাম সফিকের বাসায়। জানি তাকে পাওয়া যাবে না। সে কখনো রাত দশটার আগে বাসায় ফেরে না। সফিককে না পাওয়াই ভালো, পাওয়া গেলে ঘণ্টা দুই সময় নষ্ট হবে। দু'ঘণ্টার আগে সে ছাড়বে না। সফিক বাসায় না থাকলেও জানবে আমি এসেছিলাম। এক ধরনের সামাজিকতা রক্ষা হবে। আমি নিজেও খানিকটা স্বস্তি পাবো যে অকারণে রিকশায় করে ঘুরছি না। কাজে যাচ্ছি।

সফিক বাসায় ছিল না। সফিকের ছোট বোন সুমি দরজা খুলে বিস্মিত গলায় বলল, ও মা কি সর্বনাশ, আপনি!

সুমি এবার ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে। ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য দিনরাত পড়াশোনা করছে।

'কেমন আছিস রে সুমি?'

'আমি তো ভালই আছি। আপনি এরকম কঙ্কাল হয়ে গেছেন কেন?'

'কঙ্কাল হয়ে গেছি?'

'হুঁ। আয়না নেই আপনার ঘরে?'

'তুই নিজেও তো কঙ্কাল হয়ে গেছিস। হেভি পড়াশোনা হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে। তবে লাভ হবে না। গোল্লা খাব।'

'সফিককে ডেকে দে তো।'

'ভাইয়া বাসায় নেই। ঢাকাতেও নেই, টাঙ্গাইল গেছেন।'

'টাঙ্গাইল কেন?'

'সাহিত্য সভা, ভাইয়া হচ্ছে বিশেষ অতিথি।'

'বলিস কি!'

'আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব ঝোলাঝুলি করছিল, আমি যাইনি।'

'খুব ভাল করেছিস। কোনো বুদ্ধিমান লোক সাহিত্য সভায় যায় না। আচ্ছা, সুমি, আমি যাই। প্রধান অতিথি সাহেবকে বলিস আমি এসেছিলাম।'

'এক সেকেণ্ড দাঁড়ান। দাদার একটা নতুন বই বের হয়েছে। বইটা নিয়ে যান।'

'বই বেরিয়েছে মানে! ও বই লিখল কবে?'

'বিয়ের পর তো আপনি নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন—ভাইয়া বই লিখে ছাপিয়ে ফেলেছে। বারোশ কপি ছাপিয়েছে। বন্ধুবান্ধবকে ধরে ধরে জোর করে বই কেনাচ্ছে। আপনার কাছে কি চল্লিশ টাকা আছে? চল্লিশ টাকা দিয়ে বই নিয়ে যান। বিনা পয়সাতেই আপনাকে দিতাম। ভাইয়া শুনলে রাগ করবে।'

চল্লিশ টাকা আমার কাছে আছে—তুই বই নিয়ে আয়।

'চা খাবেন?'

'না।'

'খান একটু, কি হবে খেলে? আপনি তো আসেনই না, বিয়ের পর প্রথম এলেন। বিয়ের পর প্রথম এলে মিষ্টি খাওয়াতে হয়। ঘরে কোনো মিষ্টি নেই। চিনি খাবেন? এক চামচ চিনি এনে দিতে পারি।'

ফাজলামি ধরনের কথা। সুমি আমার সঙ্গে ফাজলামি ধরনের কথা কখনো বলে না, আজ বলছে। চোখ-মুখ কঠিন করেই বলছে। তাকে ক্ষমা করে দিলাম কারণ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এই মেয়েটি দুবছর আগে ন'পাতার একটি প্রেমপত্র লিখে রেজিস্ট্রি করে আমার নামে পাঠিয়েছিল। পুরো চিঠি পড়ার ধৈর্য ছিল না। দু'তিন পাতা পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। কি সর্বনাশ! সফিকের বাসায় তিন মাস যাওয়া বন্ধ রাখলাম। তিন মাস পর যখন গেলাম সুমির সঙ্গে খুব স্বাভাবিক আচরণ করলাম। সুমি চা দিতে এসে ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি কি কোনো রেজিস্ট্রি চিঠি পেয়েছেন?

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, আমাকে রেজিস্ট্রি চিঠি কে লিখবে? সুমি বিস্মিত হয়ে বলল, কোনো চিঠি পাননি?

আমি বললাম, না তো!

সুমির প্রণয় উপাখ্যানের এইখানেই সমাপ্তি।

চায়ের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতেই সফিকের বাবা আইডিয়েল গার্লস স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক মোজাহার সাহেব এলেন। যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, ততবারই আমার মনে হয় তাঁর বয়েস অনেকখানি বেড়েছে। আজ দেখি নিচের পাটির একটা দাঁত পড়ে গেছে। তিনি ভারি চশমার আড়ালে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কে, রঞ্জু?

'জ্বী।'

'সফিকের খোঁজে এসেছ?'

'জ্বী।'

'বাসায় এসে তাকে পাবে না। বাসার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। সে গ্রামে-গঞ্জে সাহিত্য করে বেড়াচ্ছে। কেন্দুয়া উপজেলায় তার একটা চাকরি হয়েছিল। উপজেলা হেলথ অফিসার। সে চাকরি নিল না। তার নাকি ঢাকা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। তাতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

আমি কিছু বললাম না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, হারামজাদা এখন দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক দিন পরে দেখলাম—চিনতে পারিনি। এই অবস্থা! আবার শুনেছি এর মধ্যে নাকি একটা বই লিখে ছাপিয়ে ফেলেছে। আরে

ব্যাটা তুই হচ্ছিস ডাক্তার, তুই করবি ডাক্তারি। তোর বই লেখালেখি কি? বই লেখার টাকা কোত্থেকে পেয়েছে কে জানে। তোমার কাছ থেকে নিয়েছে নাকি?

'জ্বী—না।'

'আমার ধারণা ওর মা'র কোনো গয়না–টয়না নিয়ে বেচে ফেলেছে। ওর মা অবশ্য অস্বীকার করছে। ছেলে ওর চোখের মণি। সারাজীবন খালি ছেলে ছেলে করেছে। এখন বুঝবে ছেলের মজা।'

সুমি চা এনে সামনে রাখল। মোজাহার চাচা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মনে হচ্ছে ইদানীং তিনি চোখেও কম দেখেন। যাবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলেন।

সুমি বই দিয়ে গেল। আমি তাকে চল্লিশটা টাকা দিলাম। সুমি বলল, পনেরোটা বই আমার বিক্রি করার কথা। একটা মাত্র বিক্রি করলাম। আপনি কি আরেকটা কিনবেন?

'আরেকটা দিয়ে আমি কি করব?'

'ভাবীর জন্যে নিয়ে যান। আপনি একটা পড়বেন, ভাবী পড়বেন আরেকটা।'

'আরেকদিন যখন আসব আরেকটা কিনে নিয়ে যাব। আজ টাকা নেই।'

'বাকিতে নিয়ে যান। পরে টাকা দেবেন।'

'আচ্ছা যা, নিয়ে আয়।'

সুমি আরেকটা বই এনে দিল। আমাকে বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এল। আমি যখন বললাম, "যাই সুমি" , তখন সে নিচু গলায় বলল, আপনাকে একটা কথা বলি, রাগ করবেন না তো?

'না। কি কথা?'

'আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে?'

'কে বলল?'

সুমি চুপ করে রইল। আমিও খানিকক্ষণ চুপ থেকে রাস্তায় পা বাড়ালাম। এই নিয়ে সুমির সঙ্গে কথাবার্তা বলার মানে হয় না।

বাসায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম না। অকারণে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে রাত এগারোটা বাজিয়ে ফেললাম। বাসায় ফিরে দেখি রূপা খাওয়া–দাওয়া করে ঘুমুবার আয়োজন করে ফেলেছে। লাবণ্যকে নিয়ে এসেছে তার ঘরে। আমার জন্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগও লক্ষ করলাম না। এত দেরি কোথায় করলাম তা–ও জানতে চাইল না। আমি নিজ থেকে বললাম, সফিকের কাছে গিয়েছিলাম। ওর একটা বই বেরিয়েছে।

রূপা মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই ছাপাল

আর আমাকে বলল না। আশ্চর্য তো!

'তুমি টাকা দিয়েছ?'

'হুঁ। আচ্ছা লাবণ্যকে কি তার মার কাছে দিয়ে আসব, নাকি সে থাকবে আমাদের সঙ্গে? খাট তো বড়ই আছে। থাকুক, কি বল?'

'থাকুক।'

'তুমি কি খেয়ে এসেছ?'

'না।'

'খাবে না?'

'না।'

রূপা মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

আমি সফিকের বই খুলে কয়েক পাতা পড়তে চেষ্টা করলাম। চৈত্র মাসের দুপুরের কথা দিয়ে বইটার শুরু। একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টায়ার ফেটে যাওয়ায় সে মহাবিরক্ত। এই ছেলেটিই বোধহয় নায়ক। তবে ছেলেটার নাম লোকমান। লোকমান নামের কেউ কি নায়ক হবে? মনে হয় না। ঔপন্যাসিকরা বাস্তববাদী লেখা যতই লিখুন না কেন, নায়ক-নায়িকার নামের ব্যাপারে তাঁরা খুব সাবধান। নায়কের নাম তাঁরা রাখবেন—শুভ্র, নায়িকার নাম নীলাঞ্জনা।

'বাতি জ্বালানো থাকবে?'

আমি বই থেকে চোখ না সরিয়ে বললাম, তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?

'না। আলো-অন্ধকার কোনোটাতেই আমার অসুবিধা হয় না। তুমি কি বই শেষ করে তারপর শোবে?'

'বুঝতে পারছি না। ঘুম পেলেই শোব।'

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, আজ কেন জানি আমার ঘুম আসছে না। এরকম আমার কখনো হয় না।

আমি বললাম, এমন কিছু কি ঘটেছে যার জন্যে তুমি ডিসটার্বড হয়েছ?

রূপা বলল, আমি কখনো ডিসটার্বড হই না।

'কখনো না?'

'মাঝে মাঝে হয়তো হই। তাতে ঘুমের অসুবিধা হয় না। রূপবতী মেয়েদের ডিসটার্বেনসের প্রধান কারণ হল তার শরীর। সেই শরীরটাকে আমি তুচ্ছ করে দেখতে শিখেছি। এখন আমার অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া . . .'

'তা ছাড়া কি?'

'থাক, অন্য একদিন বলব।'

রূপা পাশ ফিরল। হয়তো ঘুমিয়েও পড়ল। লাবণ্য দু'হাতে রূপার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে রেখেছে। আমি একই সঙ্গে সফিকের বই পড়ছি এবং রূপাকে দেখার চেষ্টা করছি। বই পড়ার এই হচ্ছে সমস্যা। বই এর দিকে তাকিয়ে পড়তে হয়। এমন কোনো ব্যবস্থা যদি থাকত যে যে-কোন দিকে তাকিয়ে বই পড়া যেত, তাহলে ভাল হত। গান শুনতে হলে গানের দিকে কান পেতে রাখতে হয় না। অথচ বই পড়তে হলে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

'এ্যাই, শোন।'

রূপা উঠে বসেছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার?

'খুব ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবে। ফ্রীজ থেকে।'

'ঘুম আসছে না?'

'আসছে। ঘুমুচ্ছিলাম, তৃষ্ণায় ঘুম ভেঙে গেল।'

আমি পানি আনতে গেলাম । সিঁড়ির গোড়ায় বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাবার অনিদ্রা রোগ আছে। বাবার অনিদ্রা রোগটার একটা উপকারী দিকও আছে। গভীর রাতে তিনি যখন দেখেন তাঁর মতো অন্য একজনও জেগে আছে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করেন। এবং খুশি মনে খানিকক্ষণ গল্প করেন।

আমার উপর বাবা অসম্ভব বিরক্ত। কারণ আমি দু'বছর আগে পাশ করেছি, চাকরি-বাকরির কোনো চেষ্টা করছি না। বিয়ে করে ফেলেছি কাউকে কিছু না জানিয়ে। অত্যন্ত রূপবতী একজন তরুণী আমার স্ত্রী, যার হাবভাব কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। যার উপর প্রচণ্ড রকম রাগ করার কিছু পাচ্ছে না, আবার যাকে ভালবাসবার মতোও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে দেখে বাবার মুখের কঠিন ভাব একটু নরম হল। তিনি বললেন, এখনো ঘুমুতে যাসনি?

আমি বললাম, ঘুম আসছে না।

বাবার মুখের কঠিন ভাব আরো নরম হয়ে গেল। তিনি আন্তরিক গলায় বললেন, ঘুম না এলে অস্থির হবার কিছু নেই। প্রতিরাতে ছ'ঘণ্টা ঘুমুতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। নেপোলিয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুতেন। লা মিজারেবল-এর লেখক ভিক্টর হিউগো যখন লেখালেখি করতেন, তখন দৈনিক গড়ে দু'ঘণ্টা ঘুমুতেন।

আমি বললাম, ও, তাই নাকি?

'সবাইকে যখন দেখি ঘুমের জন্যে মহাব্যস্ত, তখন আমি মনে মনে হাসি—বৌমা কি ঘুমুচ্ছে নাকি?'

'হুঁ।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বৌমার কিছু ব্যাপার নিয়ে আমি তোর সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই। যদিও খুব ভাল করেই জানি ছেলের সঙ্গে এইসব ব্যাপার ডিককাস করা উচিত না। তবে ছেলের বয়স যখন একুশ ছাড়িয়ে যায় তখন খানিকটা হলেও বন্ধুর পর্যায়ে আসে। আমি তোর সঙ্গে ডিসকাস করতে চাচ্ছি নট এজ ফাদার বাট এজ এ ফ্রেণ্ড।

'ডিসকাস করুন।'

'সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তো ডিসকাস করা যায় না। আয়, আমার ঘরে আয়।'

রূপার জন্যে পানি নিয়ে যাওয়া হল না। আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম। বাবার ঘরটা এই বাড়ির সবচে বড় ঘর। আগে এ ঘরে বাবা এবং মা ঘুমুতেন। এখন বাবা একাই ঘুমান। মা থাকেন একতলায় মুনিয়ার সঙ্গে। কারণ স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মুনিয়া দু'বার ঘুমের অষুধ খাবার চেষ্টা করেছে। রাতে তাকে চোখে-চোখে রাখতে হয়।

'বোস রঞ্জু।'

আমি বসলাম। আমার একটু গা-ছমছম করতে লাগল। বাবার এই ঘরে শৈশবে অনেকবার আসতে হয়েছে। প্রতিবারই শাস্তি ভোগ করার জন্যে। সেই শাস্তিও বিচিত্র—খাটের নিচে মাথা দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

'রঞ্জু।'

'জ্বী।'

'তুই তোর শ্বশুরবাড়ির হিস্ট্রি কিছু জানিস?'

'না।'

'খোঁজ নেয়ার ইচ্ছা হয়নি?'

'না।'

'তোর শ্বশুর যে এক বিদেশী মহিলা বিয়ে করেছিলেন, সেটা জানিস?'

'জানি।'

'ঐ বিদেশী মহিলার হিস্ট্রী জানিস?'

'না।'

'সে ছিল নর্তকী। নাইট ক্লাবে নাচত। খুব অথেনটিক সোর্স থেকে খবর পেয়েছি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু রহমান ঐদিন কথায় কথায় বললো। বলতে চায়নি—আমিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করেছি। রহমান এবং তোর শ্বশুর একসঙ্গে বাইরে ছিল। সে রূপার মা সম্পর্কে যা বলল ··· ভয়াবহ! সে সব বলতে চাচ্ছি না।

নাইট ক্লাবের নর্তকী — এই একটা বাক্যই যথেষ্ট।'

'তাতে কিছু যায় আসে না বাবা।'

'কিছু যায় আসে না?'

'না। বাইশ তেইশ বছর আগের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে?'

ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু না থাকলে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়ানো হয় কেন? বর্তমানের ভিত থাকে অতীতে। এই যে তোর স্ত্রীর কথাই ধর — তার স্বভাব, তার মানসিকতা সে নিয়ে আসবে তার মা-বাবার কাছ থেকে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এটাও ঠিক না বাবা। আমাকে দিয়ে দেখ — আমি কি তোমার মানসিকতা পেয়েছি? তুমি যে রকম আমি মোটেও সে রকম না। কাজ ছাড়া তুমি এক সেকেণ্ড থাকতে পার না, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারি। তুমি মুহূর্তের মধ্যে রেগে আগুন হও। আমি কখনো রাগি না।

তুই হচ্ছিস একটা 'মেষ'। মেরি হেড এ লিটল ল্যাম্বের এক ল্যাম্ব।

'এই কথাও তুমি আমাকে অসংখ্যবার বলেছ। আমি কখনো কথা শুনে রেগে যাইনি। এখনো যাচ্ছি না। যাই বাবা, ঘুম পাচ্ছে।'

বাবা হঠাৎ গলার স্বর বেশ কঠিন করে বললেন, আমি চাই না তুই তোর বৌ নিয়ে এই বাড়িতে বাস করিস। তুই অন্য কোথাও উঠে যা।

আমি বললাম, আচ্ছা।

'কথার কথা আমি বলছি না। আমি সত্যি সত্যি তাই চাচ্ছি।'

'শিগগিরই সব সমস্যার সমধান করে ফেলব বাবা। এখন যাই।'

আমি উঠে চলে এলাম। ফ্রীজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে এসেছি। কিন্তু রূপা ঘুমুচ্ছে . . . আহ, কি সুন্দর তাকে লাগছে!

৬

বাবার ঘরে ডাক পড়েছে।

জজীয়তীয়ের অভ্যাস তিনি এখনো ছাড়তে পারেননি। কিছু দিন পর পর তিনি জাজ সাহেবের ভূমিকায় নামেন। অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হলেও পুরো বিষয়টির নেপথ্যে যে রূপা আছে তা বুঝতে পারছি। তবে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা হবে তা বুঝতে পারছি না। এ জাতীয় বিচার সভা এর আগেও হয়েছে। শুরুটা হয় আন্তরিক ভঙ্গিতে। টি পটে চা থাকে, চা খাওয়া হয়। টুক টাক কথা হয়। শীতকালে বলা হয় — বেশ শীত পড়েছে। গরমকালে অত্যধিক গরম নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ হয়। চা শেষ হবার পর বাবা তাঁর ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারান্দার ইজিচেয়ার এই উপলক্ষ্যে বাবার ঘরে নেয়া হয়। খানিকক্ষণ তাঁর পা নাচে। এক সময় পা নাচা বন্ধ হয়। তিনি চোখ বন্ধ করে বলেন — রঞ্জু, তোমাকে আমার দু'একটা কথা বলার আছে। দেখা যায় দু'একটা না, তাঁর অসংখ্য কথাই বলার আছে। বাবার স্মৃতিশক্তি খুব একটা ভাল বলে আমার কখনো মনে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি অসম্ভব তীক্ষ্ণ। চার বছর বয়স থেকে আমি কি কি অপরাধ করেছি তা এক এক করে বলা হয়। মোটামুটি চরিত্র বিশ্লেষণ যাকে বলে। সব অপরাধ নিয়ে কথা বলা শেষ হবার পর সেদিনের আলোচ্যসূচি আসে। ঘণ্টা দুই সময় তাতে লাগে। এই দু' ঘণ্টা সময় বাবা খুব উপভোগ করেন বলেই আমার ধারণা।

আজ বাবার বিখ্যাত বিচার সভা বসল রাত দশটায়। এই জাতীয় সভায় পরিবারের সকল সদস্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাবু সভা শুরুর আগেই বলল, আমি থাকতে পারব না। পড়া ফেলে এসেছি। বাবা বললেন, দশ পনেরো মিনিটে তোমার পড়া মাথায় উঠবে না। বোস।

বাবু গম্ভীর গলায় বলল, আমার পড়াশোনার ব্যাপারটা আমি দেখব। এই বিষয়ে কেউ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। আমি ঠিক ঘড়ি দেখে কুড়ি মিনিট থাকব। এর মধ্যে যার যা বলার বলে শেষ করতে হবে।

বলেই বাবু হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিল। বাবুর এই সব কাণ্ডকারখানা সভার চরিত্র খানিকটা বদলে দিল। সভা পুরানো রুটিন মত অগ্রসর

হল না। আমি অতীতে কি করেছি না করেছি তা আলোচনা করার সুযোগ বাবা পেলেন না। সরাসরি মূল বিষয়ে চলে গেলেন —"আমি সবাইকে এখানে ডেকেছি বৌমা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলার জন্য।"

বাবু বলল, ভাবীর প্রসঙ্গে কথা বলবেন — ভাবী কোথায়?

মা বললেন, তার এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।

'যার প্রসঙ্গে কথা সে এখানে থাকবে না, তা কি করে হয়?'

বাবা বললেন, তুই খুব বিরক্ত করছিস — তার এখানে থাকার প্রয়োজন কেন নেই তা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবি। একটা সিনেমা পত্রিকায় তার একটা ছবি ছাপা হয়েছে। সেটা নিয়েই দু'একটা কথা বলতে চাই।

বাবু বিস্মিত গলায় বলল, ভাবী ছবি করছে, কাজেই সিনেমা পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হবেই। খেলাধুলা করলে স্পোর্টস পত্রিকায় ছবি ছাপা হত।

বাবা বললেন, তুই বেশি বকবক করছিস। যা তুই, তোর ঘরে গিয়ে পড়াশোনা কর। চলে যা।

বাবু ঘড়ি দেখে বলল, কুড়ি মিনিট এখনো হয় নি। কুড়ি মিনিট হোক, তারপর যাব।

মা বললেন, যে রকম ছবি ছাপা হয়েছে কোন ভদ্রঘরের মেয়ের সে রকম ছবি ছাপা হয় না। পুকুর থেকে উঠে আসছে সারা শরীর ভেজা। শাড়ি গায়ে লেপ্টে আছে। ব্লাউজ নেই — আমার বলতেও ঘেন্না লাগছে। এই পরিবারের একটা সম্মান আছে। দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে আমাদের থাকতে হয়। আমার বা তোর বাবার বংশে এ জাতীয় ঘটনা ঘটে নি।

বাবু বলল, তোমাদের বংশে কোন অভিনেত্রী ছিল না বলে এজাতীয় ঘটনা ঘটে নি। অভিনেত্রী থাকলে ঘটত।

'বাবু, তুই উঠে যা। তোর মাথা গরম হয়ে আছে।'

বাবু ঘড়ি দেখে বলল, এখনো দশ মিনিট আছে। দশ মিনিট পার হোক, তারপর যাব।

দশ মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। চারদিক নিস্তব্ধ। দশ মিনিটকে মনে হল অনন্ত কাল। বাবু উঠে যাবার পর মা বললেন, আমি এই বিষয় নিয়ে বৌমার সঙ্গে কথা বলেছি। বৌমা বলল, সে না-কি ছবি ছাপানোয় সম্মানহানির কিছু দেখতে পায় নি। আমি তাকে বললাম, এ বাড়িতে থেকে এসব জিনিস করা যাবে না। সে বলল, এ বাড়িতে আমি বেশিদিন থাকব না। অল্প ক'টা দিন। এই কথার মানে কি তাই আমি জানতে চাই। রঞ্জু, সে এই কথা কেন বলল?

আমি বললাম, জানি না।

'সত্যি জানিস না?'

'না।'

'এখন তো জানলি। এখন কি করবি?'

'আমার করার কিছু নেই। ও কি করবে না করবে সেটা ওর ব্যাপার।'

'তুই তাকে কিছুই বলবি না?'

'না।'

'ও যে তোকে যাদু করে রেখেছে তা তুই বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

বাবা বললেন, আমার এই বাড়িতে বাস করে তুমি যে উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলছ তা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি করবে না করবে তা তোমার ব্যাপার। তবে আমি তোমার জায়গায় হলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতাম।

আমি বললাম, কি রকম শাস্তি? খুন করার কথা বলছেন?

বাবা দীর্ঘসময় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যা'কে বলে বাক্যহারা। মুনিয়া অস্বস্তি নিয়ে একবার মা'র মুখের দিকে একবার বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বাবা বললেন, দেখি এক গ্লাস পানি। মুনিয়া পানি আনতে গেল। তার ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল। এই সময়টুক বাবা চুপচাপ রইলেন। বোধহয় কি বলবেন, গুছিয়ে নিচ্ছেন।

'রঞ্জু!'

'জ্বি।'

'আমার অনেকদিন থেকেই মনে সন্দেহ তুমি মানসিক দিক দিয়ে ঠিক স্টেবল নও। আজ নিশ্চিত হয়েছি।'

'ও।'

'ইনসেনিটি এক ধরনের অসুখ যা দ্রুত বাড়তে থাকে।'

আমি হাসির একটা ভঙ্গি করলাম। বাবা হতভম্ব হয়ে বললেন, হাসছ কেন? চুপ করে থাকবে না। বল কেন হাসছ?

মুনিয়া বলল, বাবা, তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ। মা, মিটিংটা আজ থাক।

বাবা বললেন, না আমার কথা শেষ হয়নি। এই বদছেলে সাদা চামড়ার এক মেয়ে বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। ওকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বল। সে যেন কালই তার বৌয়ের হাত ধরে বাড়ি থেকে বিদেয় হয়।

আমি শান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে এলাম। রূপা বলল, কি ব্যাপার তোমাদের

কিসের মিটিং?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তেমন কিছু না।

'কোন সমস্যা হয়েছে?'

'না।'

'সমস্যা হলে আমাকে বলতে পার। আমি যেহেতু তোমাদের পরিবারের কোন সদস্য না, আমি তোমাদের সমস্যা অবজেকটিভলি দেখতে পারব।'

আমি সফিকের বই হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। রূপা বলল, বইটা রাখ তো। আমার দিকে তাকাও।

আমি তাকালাম।

রূপা বলল, বাবুর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। সে বলল, তুমি নাকি একটা খুন করতে চাও? এ পারফেক্ট মার্ডার। সত্যি?

আমি জবাব দিলাম না।

রূপা বলল, কাকে খুন করতে চাও, আমাকে?

আমি চুপ করে রইলাম।

'আপত্তি না থাকলে বলতে পার। আমরা দু'জন ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারি। মানুষ হিসেবে তুমি বেশ অদ্ভুত। এই জন্যেই তোমাকে আমার এত পছন্দ। তোমাকে যে আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি সেটা কি তুমি জান?'

'না।'

'তুমি আসলে কিন্তু জান। শুধু মুখে বলছ না। তুমিও আমাকে প্রচণ্ড রকম ভালবাস, তবে ভালবেসে সুখ পাচ্ছ না। তাই না?'

আমি চুপ করেই রইলাম। রূপা বলল, সত্যিকার ভালবাসার একটা বড় লক্ষণ কি জান? ভালবেসে সুখ পাওয়া যায় না, কখনো না। আমি সারাক্ষণ তোমার পাশে থাকলেও তোমার মনে হবে — নেই নেই। পাশে কেউ নেই। আর তখনি ভালবাসার মানুষকে খুন করে ফেলার ইচ্ছা হয়।

আলোচনা অগ্রসর হল না, লাবণ্য এসে ঢুকল। তার কোলে ছোট্ট বালিশ। রূপা বলল, কি খবর লাবণ্য?

লাবণ্য গম্ভীর গলায় বলল, তোমাদের বিছানায় কি জায়গা আছে?

'কেন বল তো?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুমুব।'

'প্রচুর জায়গা আছে লাবণ্য, প্রচুর জায়গা।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়লে মা যদি নিতে আসে তাহলে কিন্তু মা'কে নিষেধ করবে।'

'অবশ্যই নিষেধ করব।'

লাবণ্য বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুনিয়া উপস্থিত হল। সে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছে। রূপা বলল, মেয়েকে তো দেয়া যাবে না।

'দেয়া যাবে না মানে?'

'ও ঘুমুতে যাবার আগে বলে গেছে ওকে যেন তোমার হাতে তুলে দেয়া না হয়। আমি ওকে কথা দিয়েছি।'

'রাতে ঘুম ভাঙ্গলে কাঁদবে।'

'কাঁদলে তোমার কাছে দিয়ে আসব। এখন তুমি একে নিতে পারবে না।'

'আমি আমার মেয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। তুমি কি বলছ?'

'আজ রাতে পারবে না। অসম্ভব।'

'সম্ভব অসম্ভব তুমি আমাকে শেখাতে এসো না।'

মুনিয়া তার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বলল, ঘুমুতে আস।

আমি বললাম, তুমি ঘুমাও। আমি একটু পরে আসছি। আমি সফিকের উপন্যাস নিয়ে বসলাম।

উপন্যাসটা গত দশদিন ধরে পড়ার চেষ্টা করছি। কয়েক পাতা পড়ার পরই বাধা পড়ে, আবার গোড়া থেকে শুরু করি। প্রথম সাত পাতা আমার দশবার পড়া হয়েছে। এতে মজার একটা ব্যাপার হয়েছে, কোন্ লাইনের পর কোন্ লাইন আমার জানা হয়ে গেছে। একটা পরিচিত গান শুনতে যেমন ভালো লাগে, পরিচিত উপন্যাস পড়তেও দেখি তেমনি আনন্দ।

রূপা বলল, সত্তর পৃষ্ঠার একটা বই শেষ করতে তোমার এতোদিন লাগছে?

আমি বললাম, বইটা মুখস্ত করার চেষ্টা করছি।

'ও আচ্ছা।'

রূপা বিছানায় শুতে শুতে বলল, সফিক কি কি তোমার খুব ভালো বন্ধু?

'একসময় ছিলো, এখন না।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধব তেমন নেই, তাই না?'

'কিছু কিছু আছে।'

'নাম বলো তো।'

আমি চুপ করে গেলাম। পড়ার মাঝখানে বাধা পড়েছে। আবার গোড়া থেকে পড়া শুরু করা দরকার। ঠিক মন বসাতে পারছি না। রূপা চুল আঁচড়াচ্ছে। বার বার

ঐদিকে চোখ চলে যাচ্ছে।

রূপা বলল, চা খাবে?

'না।'

রূপা বলল, মনে হচ্ছে উপন্যাসটা আবার গোড়া থেকে শুরু করেছো।

'হুঁ।'

'মুখস্ত হয়েছে খানিকটা?'

'এখনো না।'

'লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো। তাড়াতাড়ি হবে।'

উপন্যাসটা খুব সুবিধার লাগছে না। নায়ক কোন কাজকর্ম করে না। ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়ায়। কখনো সাইকেলে, কখনো পায়ে হেঁটে। মনে হচ্ছে তার হাঁটাতেই আনন্দ। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে শুধু হাঁটে। মাঝে মাঝে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ সেই বাড়ির বারান্দায় একজন রূপবতী তরুণীকে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। দেখা হল — এই একমাত্র আনন্দ। রূপবতী তরুণীর যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে রূপার খুব মিল। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। মিল আরেকটু কম থাকলে ভাল হত। বাঙালী মেয়ের নীলবর্ণ চোখ খুব বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

বই বন্ধ করে আমি বারান্দায় এসে দেখি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত আমার জাজ সাহেব বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বাবার ঘর থেকে ইজিচেয়ার আবার ট্রান্সফার হয়েছে বারান্দায়। বাবার হাতে চায়ের কাপ। তিনি নিঃশব্দে চা খাচ্ছেন। গভীর রাতের এই চা তিনি নিজে বানান। তাঁর বানানো চা একদিন খেয়ে দেখতে হয়। তাঁকে কি বলব, বাবা এক কাপ চা বানিয়ে দাও? যদি বলি তিনি কিভাবে রিএক্ট করবেন?

'রঞ্জু।'

'জ্বি।'

'আজ রাতে তোমার সঙ্গে যেসব কথা বলেছি তার জন্যে আমি দুঃখিত। এবং খানিকটা লজ্জিত।'

'দুঃখিত এবং লজ্জিত হবার কিছু নেই বাবা। আপনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।'

'না ঠিক বলিনি। তোমার উপর অবিচার করা হয়েছে। আই এ্যাম সরি। চেয়ারটায় বস।'

আমি বসলাম। বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমার প্রতি

আমার যে বিশেষ এক ধরনের দুর্বলতা আছে তা-কি তুমি জান?

'জানি।'

'না তুমি জান না। তবে তোমার জানা থাকা প্রয়োজন। জানলে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সহজ হবে।'

'আমাদের সম্পর্ক সহজই আছে।'

'সম্পর্ক সহজ নেই, তা আমি যেমন জানি তুমিও জান। তোমার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতার কারণ বলি। তোমার জন্মের এক মাস পরের ঘটনা। আমি তোমাকে কোলে নিয়ে হাঁটছি। ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে হাঁটার অভ্যাস নেই। হঠাৎ কি যে হল তুমি আমার কোল থেকে নিচে পড়ে গেলে।'

'এই ঘটনা আমি জানি, অনেকবার শুনেছি।'

'না শোনার কোন কারণ নেই। এটা একটা ভয়াবহ ঘটনা। তোমার জীবন সংশয় হয়েছিল। এরপর থেকে তুমি যখন উদ্ভট কিছু কর আমি নিজেকেই দোষ দেই। তোমাকে দেই না। তোমার বিচিত্র কাণ্ড কারখানার জন্যে নিজেকে দায়ী করি। আমার মনে হয় মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ঠিকমত বিকশিত হয়নি। এর ফল খুব শুভ হয় নি। তুমি ভয়বাহ ধরনের প্রশ্রয় পেয়েছ। প্রশ্রয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। আমার কথা তো শুনলে — এখন তোমার কি কিছু বলার আছে?'

'আছে।'

'বল, আমি শুনব। খুব পেশেন্ট হিয়ারিং দেব।'

আমি সহজ গলায় বললাম, বাবা, আপনি কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবেন?

জাজ সাহেব বাবা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকিয়ে রইলাম সজনে গাছটার দিকে। গাছটা মরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মরছে।

মুনিয়ার ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কি সব যেন বলছেন। লাবণ্যও জেগে উঠেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে —"মামীর ঘরে যাব। মামীর ঘরে যাব।"

ছাদের সিঁড়িতে খটখট শব্দ করতে করতে বাবু নেমে এল। তার চোখে মুখে চাপা আতংক। সে আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, দাদা, তুমি কি আমার ঘরের দরজায় কড়া নেড়েছ?

'কখন?'

'এই ধর পাঁচ মিনিট আগে?'

'না।'

বাবু চোখ বড় বড় করে বলল, দাদা, একটু আস তো আমার ঘরে।

বাবাকে ইজিচেয়ারে রেখে আমি বাবুর সঙ্গে ছাদে উঠে গেলাম। বাবু বলল, ঘুমুচ্ছিলাম বুঝলে, কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। আমি বললাম, কে? কোন উত্তর নেই। আবার কড়া নাড়া। দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। ব্যাপার কি বল তো?

আমি শান্ত স্বরে বললাম, ভূত বলেই তো মনে হচ্ছে।

'ভূত মানে? কি বলছ তুমি! ভূত আবার কি?'

'ভূত হচ্ছে অশরিরী আত্মা। তোদের ফিজিক্স কি ভূত স্বীকার করে না?'

'দাদা তুমি আমার সামনে থেকে যাও। উদ্ভট সব কথাবার্তা . . . ভূত! আমি কি কচি খোকা?'

আমি বললাম, তুই এক কাজ কর, বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাক — ভূত হলে আবার কড়া নাড়বে। ওর নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত কোন সমস্যা আছে। তোর সঙ্গে ডিসকাস করতে চায়।

'দাদা তুমি নিচে যাও। তোমাকে বলাই ভুল হয়েছে।'

আমি আমার ঘরে ঢুকে দেখি — রূপাও জেগে আছে। রাত তিনটা। এই সময়ে বাড়ির প্রতিটি মানুষ জেগে — ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

৭

লাব্যণকে তার বাবা নিয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত দিয়ে যাবার কথা। ফেরত দেয়নি। চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দুপুর একটার সময় নিয়েছে — এখন বাজছে পাঁচটা। শীতের সময় পাঁচটাতেই চারদিক অন্ধকার। মুনিয়ার মাথা খারাপের মত হয়ে গেছে। আমি বললাম, চোর ডাকাত তো মেয়েকে নেয়নি। মেয়ের বাবা নিয়ে গেছে। ফিরতে দেরি হচ্ছে। হয়ত ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছে।

মুনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লে তিন ঘণ্টা লাগবে?

'তাহলে অন্য কোন ব্যাপার। তারা হয়ত ঠিক করেছে রাতে এক সঙ্গে ডিনার করবে। কোন একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে . . . '

'চুপ কর। আমাকে না বলে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নেবে? মেয়ে তার না আমার?'

'দু' জনেরই, ফিফটি ফিফটি।'

'আমি ন'মাস পেটে ধরলাম আর মেয়ে দু'জনের ফিফটি ফিফটি?'

'অনুচিত ধরনের ভাগভাগি তো বটেই। অনুচিত হলেও কিছু করার নেই — সমাজ ঠিক করে দিয়েছে।'

মুনিয়া এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমিই সেই সমাজ। এক্ষুণি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। তাকে দেখাচ্ছে বাঘিনীর মত। আমি বললাম, তুই আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছিস কেন? সমাজের নিয়ম কানুন তো আমার তৈরি না।

'দাদা, তুই ওর খোঁজ নিয়ে আয়।'

'কোত্থেকে খোঁজ আনব? বাসায় যাব? তুই যেভাবে তাকাচ্ছিস তাতে মনে হয় বাসায় যাওয়াই উচিত। ঠিকানা দে; যাচ্ছি।'

''ঠিকানা জানি না।'

'টেলিফোন নাম্বার?'

মুনিয়া কোন কথা বলল না। দেখা গেল সে টেলিফোন নাম্বারও জানে না। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, টেলিফোন নাম্বার, ঠিকানা তুই কিছুই জানিস না?

'ঐ পিশাচটার ঠিকানা আমি রাখব কেন?'

'তা তো বটেই। তার কোন আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা আছে? সেখান থেকে পিশাচ সাহেবের ঠিকানা বের করার একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।'

'কারো ঠিকানাই আমি জানি না। ওর এক মামা থাকে নারায়ণগঞ্জে। কোথায় জানি না। মোজা কারখানার ম্যানেজার।'

আমি বললাম, এই ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এর মধ্যে এসে পড়বে। পিশাচ সাহেব নতুন সংসার পেতেছেন। এর মধ্যে একটা মেয়ে নিয়ে ঢুকাবেন না। ঢুকালে তাঁরই যন্ত্রণা। মেয়েকে তোর কাছেই দিয়ে যাবেন। অপেক্ষা করতে থাক্।

মুনিয়া উঠে চলে গেল।

আমি অলস ভঙ্গিতে সফিকের উপন্যাসের পাতা উল্টাচ্ছি। আমারো কিছু করার নেই। রূপা খুব ভোরবেলায় সেজেগুজে বের হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করি নি। সেও কিছু বলেনি। শুধু ঘর থেকে বেরুবার সময় বলল, দু'দিন ধরে তুমি দাড়ি গোফ কামাচ্ছ না। তোমাকে দেখাচ্ছে ব্যর্থ প্রেমিকের মত। আজ ফিরে এসে যেন তোমাকে ক্লীন শেভড দেখতে পাই।

এই পর্যায়ে আমি খুব সহজেই বলতে পারতাম, কখন ফিরবে?

বলিনি। বলতে ইচ্ছা করল না।

রূপা যখন ঘরে থাকে না তখন আমারো ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না। তারপরেও আজ সারাদিন ঘরেই ছিলাম। এখন আর ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। সফিকের উপন্যাসের নায়কের মত রাস্তায় নেমে পড়তে ইচ্ছা করছে। সাইকেল থাকলে ভাল হত। সাইকেলে করে ঘুরতাম। সফিকের উপন্যাসের নায়ক লোকমান রাতের বেলা সাইকেলে করে ঘুরে এবং মাঝে মাঝে সাইকেলের সঙ্গে গল্প করে। সাধারণত সাইকেলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা খুব দার্শনিক ধরনের হয়। যেমন নায়ক বলল, পথের শেষ কোথায়?

সাইকেল টুনটুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘণ্টাতেই উত্তর দিল, পথের শুরুতেই হচ্ছে পথের শেষ।

'তার মানে কি?'

'মানে খুব সহজ। শুরুই শেষ। আবার শেষই শুরু।'

'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারার কিছু নেই। পথ হচ্ছে জীবনের মত। জীবনের শেষ হচ্ছে জীবনের শুরুতে। পথের বেলাতেও তাই।'

'তাহলে ভালবাসার শেষ কোথায়?'

'ভালবাসার শেষ হচ্ছে ঘৃণার শুরুতে . . . ।'

লোকমান সাহেব এবং সাইকেলের কথাবার্তার এই হচ্ছে সামান্য নমুনা। উপন্যাস যত এগুতে থাকে কথাবার্তা ততই জটিল হতে থাকে। এমন দার্শনিক ধরনের সাইকেল লোকমান কোথায় পেয়েছে কে জানে।

আমি কাপড় পাল্টালাম। ঠিক করলাম রাত এগারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকব। বাসায় ফিরে এসে যেন দেখি লাবণ্য ফিরেছে, রূপাও ফিরেছে। মুনিয়া শান্ত হয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হবার আগে বাবার ঘরে উঁকি দিলাম। বাবা অবেলায় বিছনায় শুয়ে আছেন। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, কে?

'বাবা আমি রঞ্জু।'

'কি ব্যাপার?'

'আপনার কাছে কি হাজার তিনেক টাকা হবে?'

'কি জন্যে?'

'আমার একটু দরকার ছিল, ব্যক্তিগত প্রয়োজন।'

'আমার টাকা তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তা মনে করার কোন কারণ দেখছি না।'

'ও আচ্ছা, তাহলে থাক।'

'প্রয়োজনটা কি?'

'ভাবছি একটা সাইকেল কিনব।'

বাবা বিছানায় উঠে বসলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কি বললে?

'একটা সাইকেল কিনব।'

'হোয়াই?'

'রাতে রাস্তায় ট্রাফিক কম থাকে। তখন সাইকেলে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।'

'কেন?'

'রাতের বেলা সাইকেলে করে ঘুরে বেড়ানো খুন ইন্টারেস্টিং।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

'লোকমান।'

'লোকমানটা কে?'

'সফিক একটা উপন্যাস লিখেছে তার নায়ক।'

'তুমি সামনের চেয়ারটায় বস।'

আমি বসলাম। বুঝতে পারছি বাবা নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিচ্ছেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

'রঞ্জু।'

'জ্বি।'

'তোমার ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এইসব কি বলছ? বাবুর কাণ্ডকারখানারও কোন আগা মাথা পাচ্ছি না — সে দেখি বারান্দায় ক্যাম্পখাটে ঘুমুচ্ছে। তাকে বললাম, কি ব্যাপার? সে বলল, চিলেকোঠার ঘরে তার না-কি একা ঘুমুতে ভয় লাগে। ভূতের উপদ্রপ।'

আমি সহজ গলায় বললাম, একটা ভূত তাকে খুব বিরক্ত করছে। ঘুমুলেই কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। এ জন্যেই বারান্দায় ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় তো আর কড়া নাড়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

বাবা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও। তিন হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব। এখন দিতে পারছি না। ব্যাংক থেকে তুলতে হবে। লোকমানের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

লোকমানের মত আমি ঘণ্টাখানিক রাস্তায় হাঁটলাম। তারপর গেলাম সফিকের খোঁজে।

যথারীতি সফিক নেই। তার বোন সুমি বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি? আপনি কোত্থেকে?

আমি বললাম, যাচ্ছিলাম এইদিক দিয়ে। ভাবলাম, দেখি সফিক আছে কি-না। তার বইটা পড়া ধরেছি। দশপাতা পড়েছি।

'এক সপ্তাহে মাত্র দশপাতা?'

'ধীরে ধীরে পড়ছি। আমি তোদের মতো দ্রুত পড়তে পারি না। চা খাওয়াতে পারিস? বিকেলে চা খাওয়া হয়নি।'

'এখন তো চা খাওয়াতে পারবো না। আমরা সব বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি। এম্নিতেই আমাদের দেরি হয়ে গেছে।'

'ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ তোর সঙ্গে গল্প করবো।'

সুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি একটা বলতে গিয়েও বলল না। সে বিয়েবাড়ি উপলক্ষে সাজসজ্জা করেছে। কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের সাজলে খারাপ দেখায়। সুমি তাদের একজন। তাকে রীতিমতো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

সুমি বলল, আপনি কি বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে আলাপ করতে চান?

'হ্যাঁ।'

'আজ না। অন্য আরেকদিন আসুন। অবশ্যি আমার মনে হয় না আপনি

আলাপ করতে চান। আপনি কথার কথা বলেছেন। কেউ যখন কথার কথা বলে তখন সেটা বোঝা যায়। আচ্ছা আপনার কি কোনো কারণে মনটন খারাপ?'

'না তো।'

'আপনাকে কেমন যেন অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। আপনি বাসায় চলে যান। বাসায় গিয়ে আরাম করে ঘুমান। ভাবী কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'ভাবী সিনেমা করছেন এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'আচ্ছা, উনি না-কি অসম্ভব রূপবতী। ভাইয়া বলছিল হেলেন অব ট্রয় তাঁকে দেখলে অপমানে গলায় দড়ি দিত। সত্যি?'

'সেটা হেলেন অব ট্রয়কে জিজ্ঞেস করাটাই কি উচিত না?'

'উনাকে তো পাচ্ছি না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'হেলেন অব ট্রয় খুব সম্ভব ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। মেয়েরা সহজে গলায় দড়ি দেয় না।'

'ভাবীর সংগে আমার খুব কথা বলার শখ। একদিন যদি কথা বলার জন্যে আপনাদের বাসায় যাই উনি কি রাগ করবেন?'

'ও রাগ করতে পারে না। তবে মানুষদের খুব সহজে রাগিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা সুমি যাই। তোর মনে হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আবার কবে আসবেন?'

'দেখি। এমন খারাপ করে সেজেছিস কেন? কুৎসিত লাগছে। তোকে তেলাপোকার মতো লাগছে।'

সুমি রাগ করল না। হাসল। সুমির সংগে এই একটা দিকে রূপার মিল আছে। রূপার মতো সেও রাগ করে না। আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি। রাগাতে গেলে হাসে।

'যাই সুমি?'

'আচ্ছা যান। চা খাওয়াতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না।'

'তোকে কুৎসিত লাগছে এটা ঠিক না, ভালোই লাগছে। ঠাট্টা করে বলেছিলাম।'

সুমি চুপ করে রইল। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। নাটকীয় ভঙ্গিতে অবশ্যি বলতে পারি, বিয়ে কোথায় হচ্ছে আমাকেও নিয়ে চল্। বিয়ে বাড়িতে যতো বেশি লোক নিয়ে যাওয়া যায় ততোই ভাল। একজনকে দাওয়াত করলে পুরো ফ্যামিলী নিয়ে যেতে হয়। যিনি দাওয়াত করেছেন তাঁর যেন আক্কেল

গুডুম হয়ে যায়। আমি সিগারেট ধরাতে ধারতে বললাম, সুমি।

'জ্বি।'

'আমাকেও সংগে নিয়ে চল্। অনেকদিন বিয়ে খাওয়া হচ্ছে না।'

'আপনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? বাসায় যান তো।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, কথা বলে যতো সময় নষ্ট করলি এর মধ্যে এক কাপ চা খাইয়ে ফেলতে পারতিস।'

'বসুন তা হলে। দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি–না। আমাদের অবশ্যি এম্নিতেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বাবা এখনো ফিরেন নি। উনি ফিরলেই রওনা হব।'

আমি বসলাম।

বসার ঘরটাকে এরা মোটামুটি আস্তাবল বানিয়ে রেখেছে। বিশাল এক খাট পাতা। খাটের উপর ময়লা তোষক। কোন চাদর নেই। কেউ বোধহয় সকালে মুড়ি খেয়েছে। তোষকে এবং মেঝেতে মুড়ি পড়ে আছে। মেঝেতে তিন জায়গায় খবরের কাগজের তিনটা পাতা। টেবিল একটা আছে। সেই টেবিলে আধ খাওয়া চায়ের কাপে ভন ভন করে মাছি উড়ছে। রাতের বেলা মাছি উড়ার কথা না, কিন্তু এ বাড়িতে উড়ছে।

চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই সুমির বাবা এসে পড়লেন। এই কয়েকদিনে তিনি আরো বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাঁর আরেকটা দাঁত পড়ে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, কে?

'জ্বি আমি, আমার নাম রঞ্জু।'

'কোন রঞ্জু?'

'সফিকের বন্ধু।'

'ও আচ্ছা, সফিকের বন্ধু। হারামজাদা আছে কোথায় তুমি জান?'

'জ্বি–না।'

'দেখা হবে তার সাথে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'দেখা হলে বলবে বাসায় যেন না আসে। বাসায় এলে জুতিয়ে হারামজাদার আমি . . .'

'সফিক কি নতুন কিছু করেছে?'

'বই লিখেছে জান না?'

'শুনেছি।'

'সেই মহান সাহিত্য আবার আমাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। লেখা — আমার

পরম পূজনীয় বাবাকে . . . 'আরে ছাগল, বাপের উপর ভক্তিতে গলে যাচ্ছিস। বাপ সংসার টানতে টানতে ভারবাহী পশু হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই? তোকে ডাক্তার বানাতে গিয়ে যে পথের ফকির হয়েছি সেদিকে খেয়াল আছে রে হারামজাদা? চাকরি পেয়েছে, চাকরি করবে না। সাহিত্য করবে। করাচ্ছি তোমাকে সাহিত্য। জুতিয়ে আমি তোমার হাড্ডি ভেঙ্গে দেব। সাহিত্য কত প্রকার ও কি কি হাড়ে হাড়ে বুঝবে।'

উনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। সুমি চায়ের কাপ হাতে ঢুকল এবং বলল, খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে চলে যান। বাবার মেজাজ আকাশে উঠে গেছে। বিয়ের উপহার কিনতে গিয়েছিলেন, পকেটমা'র হয়েছে।

'তোদের তাহলে আর বিয়েতে যাওয়া হচ্ছে না।'

'মনে হয় না।'

বাসায় ফিরলাম রাত সাড়ে এগারোটায়। রূপা ফেরেনি। লাবণ্যও ফেরে নি। মুনিয়া একবার ফিট হয়েছে। তার মাথায় বর্তমানে পানি ঢালা হচ্ছে।

লাবণ্যর বাবার মামা, যিনি নারায়নগঞ্জের মোজা কারখানার ম্যানেজার তাঁর ঠিকানা পাওয়া গেছে। বাবুকে বলা হচ্ছে সেখানে গিয়ে লাবণ্যর বাবার ঠিকানা জোগাড় করতে। বাবু বিস্মিত। এরকম অদ্ভুত প্রস্তাব কেউ যে তাকে করতে পারে তাই সে ভাবতে পারছে না।

'আমাকে নারায়ণগঞ্জে যেতে বলছ?'

মুনিয়া ক্ষীণ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

'দশ দিন পর আমার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, এখন আমি যাব নারায়ণগঞ্জ?'

'হ্যাঁ।'

'ফাজলামী কথা আমার সঙ্গে না বললে ভাল হয়।'

মুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার মেয়ের কোন খোঁজ নেই এটা কি কোন ফাজলামী কথা?

'আমাকে যে নারায়ণগঞ্জ যেতে বলা হচ্ছে এটাই ফাজলামী কথা, কারণ নারয়ণগঞ্জ কোথায় তাই আমি জানি না।'

আমি বললাম, কোন সমস্যা নেই, আমি যাব নারায়ণগঞ্জ। মুনিয়া, তুই কান্নাকাটি বন্ধ কর তো। যা ভাত আন। আমি ভাত খেয়েই রওনা হব।

'ভাত খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, ভাত খাব না, ভাল করে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেয়ে রওনা দি।'

নারায়ণগঞ্জ যেতে হল না। লাবণ্যর বাবা টেলিফোন করলেন। জানা গেল বিশেষ কাজে আটকা পড়েছেন বলে তিনি লাবণ্যকে দিয়ে যেতে পারেন নি। ভোরবেলা নিয়ে আসবেন। মুনিয়ার মুখে হাসি ফিরে এল।

রাত একটার মতো বাজে।

আমি বারান্দায় অলস ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছি। ভাব করছি যেন কিছুই হয়নি। ভাবুক ধরনের একজন মানুষ ঘুমুবার আগে নৈশ ভ্রমণের একটা অংশ সারছেন। ভঙ্গিটাকে আরো জোরদার করার জন্য গুনগুন করে গান গাওয়া যায় কিংবা শিস দেয়া যায় — অবশ্যি তার এখন প্রয়োজন নেই। কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না। বাড়ি নিঝুম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোনো কিছু চিন্তা না করে মানুষ কি হাঁটাহাঁটি করতে পারে? একটা মানুষ হেঁটে যাবে কিছুই ভাববে না। তার মাথা থাকবে ফাঁকা, আমার মনে হয় এটা খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার। মানুষ সারাক্ষণই ভাবে। তার মস্তিষ্ক কখনো বিশ্রাম নেয় না। মস্তিষ্কের বিশ্রাম গ্রহণের কোনো ক্ষমতা নেই।

আমি হাঁটছি আর ভাবছি — কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবো না। পৃথিবী রসাতলে যাক —কিছুই যায় আসে না। বাস্তবে তা হচ্ছে না, মাথার ভেতরে রূপা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে ফেরেনি। কোথায় গিয়েছে তাও জানি না। মাথায় বেশ কয়েকটা সম্ভাবনা খেলা করছে। কোনোটাই খুব স্পষ্ট নয়। স্বপ্ন দৃশ্যের মতো অস্পষ্ট এবং দুর্বল যুক্তির সম্ভাবনা। মাথার ভেতর এক সংগে অনেকগুলো ভাবনা। একটা অন্যটার ভেতর জড়িয়ে জট লেগে গেছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, ভেসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যাক।

দৃশ্য–১

সময় ঃ রাত ৩টা

পুলিশের গাড়ি এসে থামল। দরজায় নক। বুটের লাথি। পুলিশ কখনো কলিং বেল বাজায় না। কলিং বেল খুঁজে বের করার মতো ধৈর্য এদের নেই। আমি দরজা খুলে দিলাম। পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি কি রূপার স্বামী? (এইখানে লজিক খুব দুর্বল। আমাকে দেখেই পুলিশ অফিসার কি করে বুঝবেন আমি রূপার স্বামী? শার্লক হোমসেরও এটা বোঝার জন্যে সময় লাগার কথা। তবে অলস চিন্তায় দুর্বল লজিকও চলে যায়।) আমি পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললাম, হ্যাঁ। আপনারা কি চান?

'আপনাকে একটু আমাদের সংগে থানায় যেতে হচ্ছে।'

'কেন বলুন তো?'

'থানায় গিয়েই বলব।'

আমি তাদের সংগে জীপে উঠে বসলাম, জীপ উড়ে চলল। পথ ফুরাচ্ছেই না। আমি ঝিম ধরে বসে আছি।

দৃশ্য–২

সময় ঃ ভোর ৯টা

আমি চা খাচ্ছি। মুনিয়া খবরের কাগজটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, এই নে কাগজ। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে চোখ বুলাচ্ছি। হেডিং পড়বার পর কোনো খবরই বিস্তারিত পড়তে ইচ্ছা করছে না। একটা খবরে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। 'অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর লাশ উদ্ধার।' যুবতীর বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে — এ রূপা। রূপা ছাড়া আর কেউ নয় . . .

দৃশ্য–৩

সময় ঃ দুপুর

আমি ঘুমুচ্ছি। টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরলাম। ও–পাশ থেকে রূপা বলল, কে? তুমি?

'হ্যাঁ।'

'ভালো আছ?'

'আছি।'

'তোমাকে একটা জরুরী বিষয় বলার জন্যে টেলিফোন করেছি।'

'বল।'

'তোমার সংগে আর জীবন–যাপন করতে পরাছি না। আমি দূরে সরে গেলাম। কিছু মনে করো না।'

'আচ্ছা।'

'টেলিফোন রাখি, কেমন?'

খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। দৃশ্যের সমাপ্তি। আমি আবার এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাঙা ঘুম জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছি।

যে তিনটি খণ্ড দৃশ্যের কথা উল্লেখ করলাম তা থেকে কি আমার মানসিক অবস্থা বোঝা যাচ্ছে? আমাকে কি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে? আমি জানি, তা

মনে হচ্ছে না। আমি প্রচণ্ড রকম দুশ্চিন্তা ভোগ করছি না। এক ধরনের শূন্যতা বোধ করছি।

আমাদের বাসার অন্য সবাইও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। যে বাড়ির বৌ কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে — রাত একটা বেজে গেছে এখনো ফিরছে না, তাদের এতো নিশ্চিন্তে ঘুমানোর প্রশ্ন উঠে না। তারা তা করতে পারছে, কারণ আমি তাদের দুশ্চিন্তা দূর করেছি। খুব ভালোভাবেই দূর করেছি।

লাবণ্যর সমস্যা মিটে যাবার পর মা যখন অত্যন্ত চিন্তিত গলায় বললেন, কি রে বউমা আসছে না কেন? তখন আমি বিস্মিত গলায় বললাম, আসবে কেন? বান্ধবীর জন্মদিনে গেছে, সেখান থেকে বাপের বাড়িতে চলে যাবে। তার কোনো এক মামাতো বোন এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। তার সংগে সারারাত গল্প বলার প্ল্যান।

'তোকে নিয়ে গেল না কেন?'

'দু'বোন গল্প করবে, সেখানে শুধু শুধু আমাকে নিয়ে যাবে কেন?'

মা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। মানুষের দুশ্চিন্তা কতো সহজেই না দূর করা যায়! এখন যদি কেউ টেলিফোন করে আমাকে শুধু বলে, রূপা বিয়েবাড়িতে গিয়ে আটকা পড়েছে, ভোরবেলা ফিরবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে যাবো। আমার সুনিদ্রা হবে। সুন্দর কিছু স্বপ্নও দেখে ফেলতে পারি।

রাত দু'টার দিকে ঘুমুতে গেলাম। ভালো ঘুম হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বপ্নও দেখলাম। স্বপ্নে দাড়িওয়ালা এক লোকের সংগে খুব গল্প হচ্ছে — কিছুক্ষণ পরপর সে বলছে, ভাইজান, ভাইজান। বলেই আবার খানিকক্ষণ পর পর হাসছে — সেই হাসি মেয়েলী গলার হাসি। গলাটিও চেনা চেনা, রূপার গলার সংগে মিল আছে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখি হাসছে রূপা। রূপা লাবণ্যকে কাতুকুতু দিচ্ছে, লাবণ্য হাসছে, রূপাও হাসছে। দু'জনই আমার বিছানায়। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুর ঘুম ভাঙল?

আমি কিছু বললাম না। রূপা বলল, আমরা দু'জন আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বিছানার পাশে হাসাহাসি করছি তারপরেও তোমার ঘুম ভাঙছে না, আশ্চর্য ঘুম তো তোমার! আমি হাই তুলে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, কখন এসেছো? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। থাক। ছাড়া ছাড়া ভাবটাই ভালো। রূপা আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, এই শুনছো?

'শুনছি।'

'কাল যা বিপদে পড়েছিলাম — মাই গড!'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ, ডেমরার কাছে আমাদের জীপ একটা ভিখিরীকে হিট করল। বেচারার মাথা ফেটে রক্তারক্তি। পাবলিক ফিউরিয়াস। কেলেংকারি হয়ে যাবার অবস্থা। আমাদের সঙ্গে আকবর ছিল। আকবর যে কোনো সিচুয়েশন ম্যানেজ করতে পারে। সে সিচুয়েশন ম্যানেজ করে ফেলল। আমরা ভিখিরীকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। থানা পুলিশ। ভিখিরী এই মরে, সেই মরে। আমরা চলে আসতে পারতাম। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইনহিউম্যান মনে হল। আমি আর আকবর দু'জন রয়ে গেলাম। তিনবার টেলিফোন করলাম, কেউ টেলিফোন ধরে না।

'ভিখিরীর অবস্থা কেমন?'

'এখন একটু স্টেবল। ডাক্তাররা বলছেন আউট অব ডেনজার। চা খাবে?'

'খেতে পারি।'

'মুখ ধুয়ে এসো। চা আসছে। মুনিয়াকে চা দিতে বলে এসেছি। সে এক্ষুণি আনবে।'

রূপা আবার লাবণ্যকে হাসাতে লাগল। তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছে। কথাবার্তা হচ্ছে সাংকেতিক ভাষায় যার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। কথা-বার্তা এ রকম,

রূপা ঃ কিটেমন ইটাছ?

লাবণ্য ঃ ভিটাল ইটাছি।

রূপা ঃ তিটুমি ইটামাকিটে ভিটাল বিটাস্?

লাবণ্য ঃ বিটাসি।

আমি ওদের অদ্ভুত ভাষার কাথাবার্তা শুনছি। মজাই লাগছে। এই ভাষার ওপর মনে হয় এদের দু'জনেরই বেশ দখল। দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে। এমন মজার কথাবার্তার মাঝখানে হাসপাতাল থেকে খবর এল ভিখিরী মারা গেছে। রূপা কাঁদতে শুরু করল। হৈচৈ ধরনের কান্না। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, বৌমা কাঁদছে কেন?

আমি বললাম, একজন ভিখিরী মারা গেছে তাই কাঁদছে।

'তামাশা করছিস নাকি?'

'না, তামাশা করছি না। শুধু শুধু তামাশা করব কেন?'

মা কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আজ মাসের প্রথম শুক্রবার।

মাসের প্রথম শুক্রবারে মা কিছু এতিম খাওয়ান। বেজোড় সংখ্যক এতিম — তিন, পাঁচ, কিংবা সাত। কোন হাদিসে তিনি পড়েছেন আল্লাহ্ নিজে যেহেতু বেজোড় তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন। বেজোড় সংখ্যার উপর আল্লাহ্‌র খাস রহমত।

কাজের ছেলে মাখন গিয়েছে এতিমের সন্ধানে। বাসায় তেহারী রান্না হচ্ছে। মা নিজেই রাঁধছেন। বাজারও তিনি নিজেই তাঁর রোজগারের টাকায় করে নিয়ে এসেছেন। কুটা বাছা সব নিজে করবেন। এতিমদের পরিবেশনার দায়িত্বও তাঁর নিজের। সোয়াবের ভাগ অন্য কাউকে দেবেন না। সবটাই তাঁর।

এতিম খাওয়ানোর দিনে আমরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকি কারণ মা'র মেজাজ থাকে খুব খারাপ। তিনি খিদে সহ্য করতে পারেন না, এই দিনে তিনি রোজা রাখেন বলে মাথা ঠিক থাকে না।

আজ তাঁর মাথা অন্যদিনের চেয়েও খারাপ কারণ কাজের ছেলে খুঁজে পেতে মাত্র দু'জন এতিম ধরে এনেছে। বেজোড় আনার কথা, জোড় এনেছে। তাদের খেতে দেয়া হয়নি, বসিয়ে রাখা হয়েছে। মাখন আবারো গেছে। তার ফেরার নাম নেই। আড়াইটা বেজে গেছে। আমাদের খাবার দেয়া হচ্ছে না, কারণ এতিম দু'জন অতিথি। এরা খাওয়া শেষ করলে আমরা খাব।

এতিম দু'জনের মধ্যে একজন উসখুস করছে। চলে যেতে চাচ্ছে। মনে হয় এ তেমন ক্ষুধার্ত না, কিংবা নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার মত সাহস তার আছে। শূন্য থালা সামনে নিয়ে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়?

পৌনে তিনটায় সাইকেলের পছনে বসিয়ে মাখন তৃতীয় এতিম নিয়ে উপস্থিত হল। মাখনের মুখ ভর্তি হাসি। মা বললেন, একটা এতিম জোগাড় করতে এতক্ষণ লাগল?

মাখন দাঁত বের করে বলল, আসল নকল বিচার কইরা আনা লাগে না? নকল এতিমে ঢাকা ভর্তি।

'যেটা এনেছিস সেটা আসল?'

'বাজাইয়া আনছি আম্মা।'

মা তিনজনকেই বসে বসে খাওয়ালেন। 'আরেকটু নাও', 'আরেকটু নাও' বলে

খাদিমদারি করলেন। খাওয়ার শেষে পান সুপারি এবং তিনটা করে টাকা দেয়া হল। মা আনন্দিত মনে ঘরে ঢুকলেন। আর তখনি রূপার সঙ্গে তাঁর বড় ধরনের ঝামেলা বেঁধে গেল। ঝামেলার শুরুটা আমি জানি না। বাথরুমে ছিলাম, শুনতে পাইনি। যা শুনলাম তা হল — মা রাগী গলায় বলছেন,

'তোমার ধারণা আমার এই এতিম খাওয়ানো ব্যাপারটা হাস্যকর?'

'জ্বি মা, আমার তাই ধারণা। খুব হাস্যকর।'

'দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষকে ভরপেট খাওয়ানো তোমার কাছে হাস্যকর?'

'যে ভঙ্গিমায় খাওয়াচ্ছেন তা হাস্যকর। আয়োজনটা হাস্যকর।

'কেন?'

'ক্ষুধার্ত মানুষ, ভিখিরী এদের জন্যে আপনার আসলে তেমন কোন মমতা নেই। এতিম খাওয়ানো উপলক্ষে হৈ চৈ করতে পারছেন — এটাই আসল।'

'এই বয়সে আসল নকল জেনে বসে আছ? দু'দিনের মেয়ে, আমার ভুল ধরতে আস? নিজের ভুলগুলি চোখে পড়ে না?'

রূপা শান্তগলায় বলল, আমার কি ভুল মা?

এর উত্তরে মা কিছু ভয়ংকর কথা বলে ফেললেন। তাঁকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। সারাদিনের পরিশ্রমে এবং উপবাসে তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। তাছাড়া এই কঠিন কথাগুলি তাঁর মনে ছিল। বলার মত পরিস্থিতি হয় নি। কে জানে মা হয়ত এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগালেন। প্রতিটি মেয়েই নিষ্ঠুর হবার অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। মা বললেন, তোমার ভুল আমাকে বলে দিতে হবে? তুমি নিজে তা জান না? সিনেমা করার নামে রাজ্যের পুরুষদের সঙ্গে যে মাখামাখিটা কর তা তুমি নিজে জান না? না-কি নিজের অজান্তে কর? আর করবে নাই বা কেন? রক্তের টান আছে না? মা'র কাছ থেকেই তো শিখেছ? তোমার মাও তো ক্লাবে ক্লাবে নেচে বেড়াতো। কোন ধরনের মেয়ে ক্লাবে ক্লাবে নেচে বেড়ায় তা কি আমি জানি না? না-কি তুমি ভেবেছ আমিও রঞ্জুর মত গাধা?

রূপা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে ঘরে উপস্থিত অন্য মানুষগুলির দিকে তাকালাম। কেউ কিছু বলছে না। কেউ মা'কে থামাবার চেষ্টা করছে না। বাবা এমন ভাব করছেন যেন তিনি কিছুই শুনতে পান নি। মুনিয়া তার মেয়ের মুখে তেহারী তুলে দেয়ায় অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত। আদর্শ মানব বাবু একমনে খেয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা মায়ের কোন কথাই তার কানে ঢুকে নি। তার প্লেটের কাছে একটা বই খোলা। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বই-এ নিবদ্ধ। আগামীকাল থেকে তার পরীক্ষা শুরু।

রূপা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিছু কিছু জিনিস আমি আমার মায়ের

কাছ থেকে পেয়েছি। আপনাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত। আসুন, খেতে আসুন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, খেতে আসব মানে? তুমি কি জান না আমি রোজা?

'না, আমি জানতাম না।'

'এখন বল — রোজা রাখাও একটা হাস্যকর ব্যাপার।'

রূপা তার জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খেতে বস। তুমি না বললে তোমার ক্ষিধে পেয়েছে?

আমি খেতে বসলাম। লক্ষ করলাম রূপা খেতে পারছে না। ভাত মাখাচ্ছে, মুখে তুলতে পারছে না। তার চোখ ভেজা। আমি রূপাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। আজ কি সে কাঁদবে? রূপা কিছু কিছু জিনিস তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। কঠিন আঘাতে না কাঁদার স্বভাবও কি তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া?

বাবা খুব সম্ভব প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, বিরিয়ানী এবং তেহারী এই দু'টা জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি?

আদর্শ মানব বাবু অবাক হয়ে বলল, আমাকে কিছু বলছেন?

'বিরিয়ানী এবং তেহারী এই দুয়ের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি বাবুর্চি? আমাকে এমন জিনিস জিজ্ঞেস করবেন যার উত্তর আমি জানি। যেমন ধরুন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন — ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তাহলে আমি বলতে পারব। সেটা কি জানতে চান?'

বাবা অসম্ভব বিরক্ত হলেন। বাবু তাকাল রূপার দিকে।

'ভাবী, তুমি জানতে চাও?'

'চাই।'

'সত্যি চাও না কথার কথা?'

'সত্যি চাই।'

'ঠিক আছে বলছি। নিউটনের নাম শুনেছ তো ভাবী? নিউটনের গতিসূত্র দিয়ে শুরু করা যাক . . .'

বাবু বক বক করে যাচ্ছে। রূপা মনোযোগী ছাত্রীর মত তাকিয়ে আছে বাবুর দিকে। আমি তাকিয়ে আছি রূপার চোখের দিকে। দেখতে চাচ্ছি তার ভেজা চোখ কি শুকিয়ে যাবে? না-কি শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সামলাতে পারবে না? কতটুক শক্ত এই মেয়ে!

খাওয়া শেষ করে ঘরে এসেছি। রূপা পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকল। হাসি মুখে বলল, মা মিষ্টি পান আনিয়েছেন। পান খাবে?

আমি পান নিলাম।

তুমি বিছানায় বস তো। আমি তোমার ইজিচেয়ারটায় বসে দেখি কেমন লাগে।

আমরা জায়গা বদল করলাম। রূপা বলল, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি মুনিয়ার হাসবেণ্ড অর্থাৎ এক্স হাসবেণ্ড টেলিফোন করেছিলেন। তোমার সঙ্গে তাঁর না-কি ভীষণ জরুরী কথা আছে। ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। দেখা করতে বললেন।

'কবে দেখা করতে হবে?'

'আজ। বিকেলে চলে যেও।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি ঘুমুবে? ঘুমুতে চাইলে চাদর গায়ে শুয়ে পড়। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি।'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

রূপা হাসল। আমি বললাম, হাসছ কেন?

রূপা হাসতে হাসতে বলল, তোমার পড়ুয়া ভাইকে কিছুক্ষণ আগে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করলাম। সে ধাঁধা শুনে পুরোপুরি ভড়কে গেছে — আমার ধারণা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এখন সে এইটা নিয়েই ভাববে।

'কি ধাঁধা"

'খুব সহজ ধাঁধা। দু'জন ছেলেকে তাদের বাবারা কিছু টাকা দিয়েছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ টাকা, অন্যজন দিলেন ১০০ টাকা। ছেলে দু'জন তাদের টাকা গুনে দেখল একত্রে তাদের টাকা হয়েছে মাত্র ১৫০। কি করে সম্ভব হল? তুমি কি পারবে?'

'না।'

'বাবুও পারবে না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সহজ জিনিসগুলি খুব জটিল ভাবে চিন্তা করে। তাদের পক্ষে এই ধাঁধার উত্তর বের করা অসম্ভব।'

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

রূপা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের ভাব সহজ। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয়নি। দুপুরের ঘটনাটা সে মাথা থেকে দূর করে দিয়েছে। রূপা বলল, চা খাবে?

'না।'

'খাও একটু। মতির মা'কে চা দিতে বলেছি। সে চা নিয়ে আসবে।'

'আচ্ছা।'

মতির মা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমি এবং রূপা চা খাচ্ছি। চা খেতে খেতে রূপা বলল, আমি যখন কোন কথা বলি তখন কি তুমি মন দিয়ে শোন, না শুধু তাকিয়ে

থাক?

'মন দিয়ে শুনি। সবার কথাই আমি মন দিয়ে শুনি।'

'তোমার মা আজ ভাত খাবার সময় যে কথাগুলি বলেছিলেন তুমি কি তা মন দিয়ে শুনেছ?'

'হুঁ।'

'আমার মা সম্পর্কে তিনি যা বললেন সেগুলি কি তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে?'

'না।'

'যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়ে থাকে তাহলে কেন তুমি তোমার মা'কে চুপ করতে বললে না? আমি যে কি ভয়ংকর লজ্জা পাচ্ছিলাম তা তোমার চোখে পড়েনি?'

'চোখে পড়েছে।'

'তাহলে চুপ করে ছিলে কেন? প্রতিবাদ করনি কেন?'

রূপার গলার স্বর বদলে যাচ্ছে। চোখের তারায় অন্য এক ধরনের আলো। সে আজ বিশেষ কিছু বলবে। সেই বিশেষ কথাগুলি শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। রূপা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ঠোঁট মুছল, তারপর আগের চেয়েও নিচু গলায় বলল, প্রতিবাদ আমি নিজেও করতে পারতাম। ভণ্ডামী, ভান এইসব আমার ভাল লাগে না। যেখানে এইসব দেখেছি কঠিন গলায় প্রতিবাদ করেছি। তোমার মা'র কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না, কারণ তিনি যা বলেছেন সত্যি বলেছেন। এক বিন্দু মিথ্যা নয়।

'তাতে কিছু যায় আসে না।'

'সবটা শোন তারপর বল, "তাতে কিছু যায় আসে না"। আমার মা আর্ট স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। অহংকারী জেদী একটি মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী। আমি বলেছি না মা'র কিছু কিছু জিনিস আমি পেয়েছি। রূপ হচ্ছে তার একটা। কিন্তু মা ছিলেন দরিদ্র। তাদের পুরো পরিবারটাই দরিদ্র। দু'বেলা খাবার সামর্থও এই পরিবারের ছিল না। এমন একটা পরিবারে রূপবতী মেয়ে হয়ে জন্মানোর হাজারো সমস্যা। মা আর্ট স্কুলের পড়ার খরচ চালাতে পারেন না। অনাহারের কষ্টও এক সময় অসহ্য বোধ হল। এক সময় দেখা গেল ছুটির দিনে নাইট ক্লাবগুলিতে তিনি নাচতে শুরু করেছেন। বাড়তি কিছু টাকা আসছে।'

আমি বললাম, থাক এসব।

রূপা বলল, থাকবে কেন? আমি তো বলতে লজ্জা পাচ্ছি না। তুমি শুনতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমার মা প্রতিটি ঘটনা আমাকে বলেছেন। যখন বলেছেন তখন

আমার বয়স খুব অল্প। তিনি বলতে লজ্জা পান নি, আমিও মার কথা শুনে লজ্জা পাইনি। তুমি কেন পাবে? মা বলতেন — শরীর এবং মন আলাদা আলাদা। শরীর অশুচি হলেই মন অশুচি হয় না। এটা হয়ত তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলতেন।

'মা ভয়ংকর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আমার বাবা তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। বিয়ে করেন। দেশে নিয়ে আসেন। মা'র সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কেমন লাগছে তোমার গল্পটা?'

'ভাল?'

'শুধু ভাল? এটা কি চমৎকার একটা গল্প না?'

'হ্যাঁ চমৎকার গল্প।'

'এই চমৎকার গল্পের একটা ভয়ংকর অংশ আছে। সেই অংশটা এখন আমি তোমাকে বলব।'

'বল।'

'বাবা যখন আমার মা'কে বিয়ে করেন তখন আমার মা অন্তঃসত্তা। আমার মা ঠিক জানেন না — আমার বাবা কে। এইসব কিছুই আমি তোমাকে বলিনি। এখন বললাম, কারণ পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। আমার চাচারা বাবার সম্পত্তির জন্যে মামলা মোকদ্দমা করবেন। একজন অবৈধ কন্যা বিপুল সম্পত্তি পাবে তা তো হয় না। বাবার শরীর অসুস্থ। তিনি যে দীর্ঘদিন বাইরে থাকেন চিকিৎসার জন্যে থাকেন। সম্পত্তি নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় এসে গেছে।'

আমি চুপ করে আছি। দেখছি রূপাকে। মানুষ কি করে এত সুন্দর হয়!

রূপা বলল, আমি এখন যে কথাগুলি বললাম তা কি তুমি তোমার বাবা, মা, ভাইবোন — এদের বলতে পারবে?

'না।'

'আমার ধারণা হয়েছিল পারবে। আমি এমন একজনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম যে সবকিছু তুচ্ছ করে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে। আমার চারপাশে অনেকেই ছিল। তিনজনের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তুমি ছিলে দু' নম্বরে।'

'এক নম্বরে কে ছিল?'

'সফিক ছিল এক নম্বরে।'

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি ঘুমুব। আমাকে একটু জায়গা দাও তো। সে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত জেগে তার পাশে বসে রইলাম। সে গভীর ঘুমে অচেতন। ঘুমের মধ্যেই

হাসছে, স্বপ্ন দেখছে হয়ত।

সন্ধ্যা মিলাবার পর বেরুলাম। মুনিয়ার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখান থেকে একবার যাব সফিকের কাছে। তারপর? তারপর কি আমি জানি না। একটা সাইকেল থাকলে ভাল হত। সাইকেলে করে সারা শহর চক্কর দেয়া যেত।

৯

মুনিয়ার স্বামী আজহার সাহেব আমাকে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘ ভনিতার পর যা বললেন তা হচ্ছে — তিনি ভুল করেছেন। ভুল সংশোধন করতে চান। মুনিয়া এবং লাবণ্যকে নিয়ে আবার সংসার শুরু করতে চান। আমি বললাম, যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন তার কি হবে? তিনি বিরক্ত মুখে বললেন — ও চুলোয় যাক। হু কেয়ারস? আপনি ভাই একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব। মানুষ ভুল করে না? আমি একটা ভুল করে ফেলেছি . . .

আমি হালকা গলায় বললাম, আপনি দেরি করে ফেলেছেন।

'দেরি মানে?'

'মুনিয়ার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'সে কি?'

'সে কি বলছেন কেন? তার এমন কি বয়েস। সে বিয়ে করবে না? মোটামুটি বেশ ভাল একটা ছেলের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলেটিকে তার খুব পছন্দ।'

'আমি তো এইসব কিছু জানি না।'

'আপনার জানার কথাও না। ছেলেটিকে তার পছন্দ, কারণ প্রায়ই দেখি দু'জন চায়নিজ-টায়নিজ খেতে যায়।'

'কি বলেন এসব! মুনিয়া এটা করতে পারে না।'

'পারছে তো?'

'ঐ ছেলের ঠিকানা কি?'

'এখন আপনাকে ঠিকানা দেব না। ঠিকানা দিলে ঝামেলা করতে পারেন। বিয়ে হোক, তারপর ঠিকানা পাবেন। আমি বরং মুনিয়াকে বলব সে যেন তার স্বামীকে নিয়ে আপনাদের বাসায় বেড়াতে যায়।'

আজহার সাহেব অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর ভুবন উলট পালট হয়ে গেছে। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম — যাই? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সফিককে দেখে চিনতে পারছি না।

ইয়া দাড়ি — ইয়া বাবরি চুল। গায়ে চক্রাবক্রা শার্ট, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ এবং চোখে কালো চশমা। সফিক বলল, কি ব্যাপার বাক্যহারা হয়ে গেলি?

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, দাড়ি কবে রাখলি?

'দাড়ি কবে রাখলি মানে? এই দাড়ির বয়স চার মাস। গত চার মাসে খুব কনজারভেটিভ এস্টিমেট নিলেও তোর সঙ্গে তিনবার দেখা হয়েছে। এখন তুই জিজ্ঞেস করছিস দাড়ি কবে রাখলি?'

'সরি, আগে লক্ষ্য করিনি।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার তো মনে হচ্ছে তুই আমাকে চিনতে পারছিস না। বলতো আমি কে? ঠাট্টা না। আই এ্যাম সিরিয়াস, বল, আমি কে?'

সফিকের কথার জবাব দিলাম না। সে আমাকে তাদের বাসার সামনের চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। হাসি মুখে বলল, তোকে বাসায় নেয়া যাবে না, আমার কোনবন্ধু বান্ধব বাসায় গেলেই বাবা প্রায় লাঠি নিয়ে মারতে আসে। মনে হচ্ছে উনার ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে।

সফিক পরপর দু'কাপ চা খেল। সিগারেট ধরাল না। জানলাম সে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল না-কি আর সিগারেটের ধুয়া সহ্য করতে পারছে না। আমি বললাম, চোখে সানগ্লাস কেন?

সে ক্লান্ত গলায় বলল, আমার প্যাঁচার স্বভাব হয়ে গেছে। চোখে আলো সহ্য হয় না। এজন্যেই চারদিক অন্ধকার করে রাখি। শুনলাম পরপর দু'দিন তুই আমরা খোঁজে বাসায় গিয়েছিলি। কারণ কি?

'কারণ নেই।'

'অকারণে তুই আমার খোঁজে যাবি, এটা বিশ্বাসযোগ্য না। কারণটা কি বল।'

'তোর বইটা পড়লাম। ভাবলাম কথা বলি।'

'তুই আমার বই পড়েছিস? এটাও বিশ্বাসযোগ্য না।'

'আজকাল অনেক অবিশ্বাস্য কান্ডকারখানা করছি। তোর বই সত্যি পড়েছি।'

'শেষ পর্যন্ত পড়েছিস?'

'না। প্রথম চৌদ্দ পাতা।'

সফিক আহত চোখে তাকিয়ে রইল। তার অতি প্রিয় বন্ধু চৌদ্দ পাতার বেশি পড়েনি এই কঠিন সত্য সে মেনে নিতে পারছে না। আমার মনে হল সে খানিকটা রাগও করছে। বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে। প্রচন্ড রেগে গেলে সেই কাজটি করে। আমি তার রাগ কমানোর জন্যে বললাম, চৌদ্দ পাতা পড়লেও পড়েছি খুব মন দিয়ে।

'মন দিয়ে পড়েছিস?'

'হুঁ। আমার মতো মন দিয়ে কেউ পড়েছে বলে মনে হয় না।'

সফিক থমথমে গলায় বলল, ইচ্ছা করছে তোকে মেরে তক্তা বানিয়ে দেই।

ফাজলামির একটা সীমা আছে।

আমি হাই তুলে বললাম, তুই শুধু শুধু রাগ করছিস। আমি সত্যি খুব মন দিয়ে পড়েছি। মুখস্ত বলতে পারবো।

'ও আচ্ছা। মুখস্ত বলতে পারবি? ছোটলোক কোথাকার।'

'আগেই গালাগালি করছিস কেন? আগে দেখ পারি কি–না।'

আমি চোখ বন্ধ করে বলা শুরু করলাম। যেহেতু চোখ বন্ধ করে আছি, সফিকের রিঅ্যাকশন ধরতে পারছি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি — তার আক্কেলগুড়ুম। তার নিজের বই সে নিজেও মুখস্ত বলতে পারবে না। বলতে পারার কোনো কারণ নেই।

দম নেবার জন্য থামতেই সফিক বলল, যথেষ্ট হয়েছে থাম তো। আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। তুই দেখি সত্যি সত্যি মুখস্ত করে বসে আছিস। অকল্পনীয় ব্যাপার।

'তুই খুশি হয়েছিস তো?'

'খুশি হবো কেন? এটা কি খুশি হবার কথা? এসব পাগলের লক্ষণ, তুই পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছিস। তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার। কোনো সুস্থ মানুষ উপন্যাস মুখস্থ করে? রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী হলেও কথা ছিল। অবশ্যি হৈমন্তী মুখস্থ করাও এক ধরনের পাগলামী। পৃথিবীতে কেউ উপন্যাস মুখস্থ করে না।

'করে না বুঝি?'

'না করে না। যারা মেন্টাল কেইস তারাই করে। তুই দেরি না করে ডাক্তারকে দিয়ে মাথাটা পরীক্ষা করা। ওষুধপত্র খা। রাতে ঘুম হয়?'

'না।'

'ঘুমের ওষুধ খা। দশ মিলিগ্রাম করে রিলাক্সেন। সকাল দশটার দিকে একবার, রাতে ঘুমতে যাবার সময় একবার।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুই প্রেসক্রিপশন দিচ্ছিস যে? তুই কি ডাক্তার না–কি?

সফিক হতভম্ব হয়ে বলল, কি বলছিস তুই? আমি ডাক্তার না? মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করিনি? তোর কি হয়েছে বল তো?

'মনে ছিল না।'

'সামথিং ইজ ভেরী রং।' তুই কাল বাসায় থাকিস। এগারোটার দিকে এসে আমি তোকে নিয়ে যাবো। ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট তোকে দেখুক। রূপার সঙ্গে তোর সম্পর্ক কেমন যাচ্ছে?'

'ভালো।'

'তার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। চল যাই রূপার সঙ্গে কথা বলি, ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি তো?'

'ছাড়াছাড়ি হবে কেন?'

'বাজারের অনেক ধরনের গুজব, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম। ওর নাকি তিনটা চয়েস ছিল। তুই ছিলি দু'নম্বার। সত্যি নাকি?'

'জানি না — ওকে জিজ্ঞেস কর।'

'চক্ষুলজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারি না। মনে ক্ষীণ আশা যে আমার নাম এক নম্বরে কিংবা তিন নম্বার ছিল। তুই আবার রাগ করছিস না তো?'

'না।'

'চল ওঠা যাক। কাল বাসায় থাকবি। কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।'

রাত দশটার দিকে বাসায় ফিরতেই দেখি মা-বাবা দু'জনেরই মুখে হাসি। আজহার সাহেব নাকি বাসায় এসেছিলেন। সব মিটমাট হয়ে গেছে। তিনি মুনিয়াকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মা বললেন, রঞ্জু, তুই থাকলে মুনিয়ার কাণ্ড দেখতি। খুশিতে এই হাসছে, এই কাঁদছে।

আমি বললাম, যে মেয়েটাকে আজহার সাহেব বিয়ে করেছেন তার কি হবে?

মা রাগী গলায় বললেন, তার কি হবে তা নিয়ে আমাদের কিসের মাথাব্যথা? যা হবার হবে।

'তোমরা সবাই খুশি?'

'খুশি হব না? তোর কি ধরনের কথাবার্তা? তার উপর জামাই বলল, তুই না-কি উল্টা পাল্টা কি সব বলেছিস। মুনিয়ার বিয়ে হচ্ছে এইসব।'

'ঠাট্টা করে বলেছি।'

'তোর মাথাটা খারাপ রঞ্জু। তুই একজন ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করা।'

'করাব। কাল সফিক আমাকে একজন পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাঁকে বলব ভালমত চিকিৎসা করাতে। মুনিয়া কোথায় মা?'

'ও আজহারের সাথে বের হয়েছে। রাতে বোধ হয় বাইরে খাবে।'

'ভালই তো।'

'লাবণ্য সঙ্গে যাবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। যেতে দেইনি। ওরা দু'জন একা একা কথা বলুক। কি বলিস রঞ্জু?'

'ভাল কাজ করেছ মা। খুব ভাল করেছ। বেজোড় সংখ্যক এতিম খাওয়ানোর ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে।'

আমি আমার ঘরে ঢুকে জানলাম রূপা চলে গেছে। আমি তেমন অবাক হলাম না। সে চলে যাবে জানতাম। আজই যে যাবে তাও জানতাম।

লাবণ্য পা ঝুলিয়ে আমার খাটে বসে আছে। তার মুখ গম্ভীর। আমি অবিকল রূপার মত গলায় বললাম — কিটেমন ইটাছ?

লাবণ্যর বলা উচিত, ভিটাল ইটাছি। সে কিছু বলছে না।

'মন খারাপ লাবণ্য?'

'না।'

'লুডু খেলবে? যাও লুডু নিয়ে আস, আমরা দু'জন লুডু খেলব।'

'না।'

রাতে ভাত খেতে বসলাম শুধু আমি আর বাবা। তাঁর মেজাজ খুব ভাল। তিনি কোমল গলায় বললেন, শুনলাম বৌমা নাকি রাগ করে বাবার বাড়িতে চলে গেছে?

আমি ভাত মাখতে মাখতে বললাম, চলে গেছে এইটুক জানি। রাগ করে গেছে কিনা তা তো জানি না।

'চিঠিপত্র কিছু লিখে যায় নি?'

'না।'

'দুপুরবেলা তোর মা খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

আমি কিছু বললাম না। বাবা বললেন, ওদের বাসায় টেলিফোন করে দেখ্। চিন্তা করিস না।'

'চিন্তা করছি না।'

'ও আচ্ছা, ভাল কথা তোর ঐ তিন হাজার টাকা এনে রেখেছি। নিয়ে যাস।'

রূপাদের বাসায় টেলিফোন করলাম। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না । তার বাবা নিশ্চয়ই দেশের বাইরে। রূপার চাচার বাসায় টেলিফোন করলাম। টেলিফোন ধরল। আমি সহজ গলায় বললাম, রূপা আছে?

'না।'

'সে কি এসেছিল?'

'না। আপনি কে বলছেন?'

'আমি রূপার খুব পরিচিত একজন। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'ওর শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ করুন।'

'আচ্ছা।'

নিজের ঘরে এসে সিগারেট টানছি। বাবু ঢুকল। তার চোখ-মুখ শুকনো। দেখাচ্ছে খুব কাহিল। আমি হাসি মুখে বললাম, কি খবর?

বাবু কাঁপা গলায় বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা।

'কি সর্বনাশ?'

'ভাবী কি একটা ধাঁধা দিয়ে গেছে। কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। পড়তেও পারছি না। কাল পরীক্ষা। ভাবীর কাছ থেকে উত্তরটা জানতে এসেছি।'

'ও তো বাসায় নেই।'

'দাদা তুমি উত্তরটা জান? দু'জন ছেলেকে তাদের বাবারা কিছু টাকা দিয়েছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ টাকা . . .'

আমি বাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এর উত্তর আমি জানি না।

'এখন তাহলে কি করব?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখ্। জ্ঞানী মানুষ, উনি পারবেন।'

বাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অনেক রাতে ঘুমুবার আয়োজন করছি, মা লাবণ্যকে কোলে নিয়ে উপস্থিত। আমি বললাম, কি ব্যাপার? মা বললেন, লাবণ্য আজ তোর সঙ্গে থাক।

'কেন?'

'ওর বাবা আজ থাকবে এ বাড়িতে। কোথায় আর ঘুমুবে? মুনিয়ার ঘরেই থাকবে। অসুবিধা তো কিছু নেই। স্বামী স্ত্রী ছিল — সাময়িক সমস্যা গেছে। আবার তো বিয়ে হচ্ছে, তাই না?

'তা তো ঠিকই।'

মা লাবণ্যকে আমার পাশে শুয়ে দিলেন। একবারও জানতে চাইলেন না রূপা কোথায়।

১০

যে ডাক্তারের কাছে আমাকে সফিক নিয়ে গেল, আমি তাঁর বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব দিলাম না। অবশ্যি ভদ্রলোকে বলে দিয়েছিলেন কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে দেবেন না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসবেন। আমি বুঝবো আপনি জবাব দিতে চাচ্ছেন না। ডাক্তারের সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

ডাক্তার ঃ কেমন আছেন?

আমি ঃ ভালো।

ডাক্তার ঃ কি রকম ভালো?

আমি ঃ বেশ ভালো।

ডাক্তার ঃ রাতে ঘুম হয়?

আমি ঃ হয়।

ডাক্তার ঃ আপনার নিজের কি ধারণা, আপনার কোনো সমস্যা আছে?

আমি ঃ আছে। একটাই সমস্যা।

ডাক্তার ঃ বলুন তো শুনি।

আমি ঃ আমি একটা খুন করার পরিকল্পনা করেছি।

ডাক্তার ঃ তাই না কি?

আমি ঃ হ্যাঁ তাই।

ডাক্তার ঃ কি ধরনের পরিকল্পনা?

আমি ঃ ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারেন। দিনক্ষণ, মার্ডার উইপন সব ভেবে রেখেছি।

ডাক্তার ঃ কাকে খুন করবেন ?

আমি ঃ (ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলাম)

ডাক্তার ঃ কবে নাগাদ খুনটা করবেন?

আমি ঃ (আবার হাসি।)

ডাক্তার ঃ মেয়েদের প্রতি কি আপনার কোন বিদ্বেষ আছে?

আমি ঃ আবারো হাসি।

ডাক্তার ঃ শুনেছি আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। আপনার বন্ধু আমাকে টেলিফোনে বলেছেন। কথাটা কি সত্যি?

আমি ঃ কথা সত্যি নয়। আমি সফিকের লেখা একটা উপন্যাস মুখস্থ বলতে পারি। পুরোটা না, প্রথম পনরো পাতা — শুনবেন?

ডাক্তার ঃ দেখি মুখস্থ বলুন তো শুনি।

আমি বলতে শুরু করলাম। ডাক্তার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে হয় আমার মতো রুগী তিনি এর আগে পাননি। কিছুক্ষণের ভেতরেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, উপন্যাসটা কেন মুখস্থ করেছেন? খুব ইন্টারেষ্টিং?

'না।'

'তাহলে? মুখস্থ করার কারণ কি?'

'এমনি করলাম।'

'ও আচ্ছা। আপনি আগামী রবিবারে আসতে পারবেন? আরো কিছু পরীক্ষা করবো।'

'আসবো । রবিবারে আসবো।'

ডাক্তারের ঘর থেকে বের হয়ে সফিক বলল, তোর অবস্থা খুবই খারাপ। মনে হয় ব্রেইনের নাট বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে।

আমি বললাম, এই ডাক্তার নিশ্চয়ই সব আবার জোড়া লাগিয়ে দেবেন।

'তা দেবেন। খুব ভাল ডাক্তার। ভাবছি বাবাকে একবার দেখাবো।'

'উনারও কি নাট বল্টু খুলে পড়ে গেছে?'

'হুঁ। আজ বাসায় বিশ্রী এক কাণ্ড করেছেন। সুমিকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলেছেন। একেবারে রক্তারক্তি। এত বড় মেয়েকে কেউ মারতে পারে?'

'কি জন্যে মারলেন?'

'জিজ্ঞেস করিনি। মনে হয় মেডিক্যালে এ্যালাও হয়নি। মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। একটা ভাল ছেলে পেলে সুমির বিয়ে দিয়ে দিতাম। আচ্ছা শোন, বাবু কি সুমিকে বিয়ে করবে? তোর কি মনে হয়?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

'বাবু তো এবার এম এসসি দিচ্ছে তাই না?'

'দিচ্ছে না। ফার্স্ট পেপার পরীক্ষায় অর্ধেকটা প্রশ্ন আনসার করে হল থেকে বের হয়ে এসেছে।'

'বলিস কি, কেন?'

'রূপা ওকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল। ঐ ধাঁধা তার মাথায় ঘুরছে। ধাঁধার উত্তর না জানা পর্যন্ত সে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

'রূপার কাছ থেকে জেনে নিলেই হয়।'

'তা হয়। কিন্তু রূপাকে সে পাবে কোথায়?'

'তার মানে?'

'ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন ট্রেস নেই। কোথায় আছে কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

সফিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, আমার সঙ্গে একটু আয়, একটা সাইকেল কিনব।

'সাইকেল দিয়ে কি করবি?'

'তোর উপন্যাসের নায়ক লোকমান সাহেবের মত ঘুরে বেড়াব।'

।।১১।।

আমরা একটা সাইকেল কিনেছি। গভীর রাতে সাইকেলে করে দু'জন ঘুরে বেড়াই। সফিক প্যাডেল করে, আমি বসে থাকি পেছনের ক্যারিয়ারে। মাঝে মাঝে রূপাদের বাড়ির সামনে থামি। বাড়ি তালাবন্ধ। অনেকদিন ধরেই নোটিশ ঝুলছে, "বাড়ি বিক্রয় হইবে।" নোটিশটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার সাইকেলে চড়ে বসি। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা তেমন হয় না। নীরবতা অসহ্য বোধ হলে সফিক টুনটুন করে ঘন্টা বাজায়। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, আহ্ থামা তো। সফিক ঘন্টা বাজানো বন্ধ করে। মাঝে মাঝে চাঁদনী রাতে আমরা শহর ছেড়ে দূরে চলে যাই। রাস্তা ফাঁকা থাকলে সফিক সাইকেল চালায় ঝড়ের বেগে। জোছনা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাই . . . আমি চাপা গলায় বলি — আরো তাড়াতাড়ি প্যাডেল কর, আরো দ্রুত। সফিক হাঁপাতে হাঁপাতে প্যাডেল করে, পেছনে পড়ে থাকে চাঁদের আলোয় ঢাকা আশ্চর্য শহর।